ঝড়ের পালক

বিমল ঘোষ (মৌমাছি)

এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স । কলকাতা বারো

প্রকাশক: নির্মলেন্দু ভদ্র

এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স।

এ-৯, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২।

মুদ্রাকর। সুরেন্দ্রনাথ পান।

নিউ সরস্বতী প্রেস, ১৭, ভীম ঘোষ লেন, কলকাতা-৬।

প্রচ্ছদ-চিত্রণ। বিমল দাস।

প্রচ্ছদ-ব্লক। স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড।

প্রচ্ছদ-মুদ্রণ। স্কোয়ার প্রিন্টার্স।

প্রথম প্রকাশ। মহালয়া ১৩৬৬ বাং।

অক্টোবর ১৯৫৯ ইং।

এ. পি.র নিবেদন।

ঝড়ের পালক। মৌমাছি।

দাম। তিন টাকা।

বন্ধুবর সুবোধ ঘোষের

করকমলে—

আমার প্রথম উপন্যাস "মায়ের বাঁশি" পড়ে বাংলাদেশের সব বয়সের পাঠক-পাঠিকারাই খুশি হন। তাগিদ দেন ঐধরণের আরও উপন্যাস লেখার জন্য।

আনন্দবাজার পত্রিকার কর্ণধার সুহৃদ্বয় অশোক কুমার সরকারও এ বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহে আনন্দবাজার পত্রিকাতেই—ঝড়ের পালক প্রকাশিত হয়। এখন সেটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করলেন এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স। এঁদের সকলকেই জানাচ্ছি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

শ্রীবিমল ঘোষ
(মৌমাছি)

আশ্বিন, ১৩৬৬।

এক

ছেচল্লিশ সালের সেই দাঙ্গা। শয়তান সাপুড়েদের বাঁশিতে হিংসার রাগিণী। সেই সুর শুনে ফণা তুলেছিল সাম্প্রদায়িকতার কালনাগিনী। কী ভয়ানক বিষ ঢেলেছিল তাদের মনে, যারা দিনের পর দিন একসঙ্গে হেসেছে, কেঁদেছে। বছরের পর বছর যারা এ ওর জমিতে বাস করেছে। বাস করেছে পাশাপাশি ঘর বেঁধে ভায়ের মতো। পেয়েছে একই ভাষা থেকে, একই মাটি থেকে—দেশ-মায়ের স্নেহ-সুধা! সেই মাটির নাড়ীর যোগ ছিঁড়ে দেশের মাটি ভাগাভাগি করার ক্ষেপা নেশায় মাতাল হয়ে উঠেছিল তারাই সেদিন। বেধে উঠেছিল কী ভীষণ গোলযোগ! কী ভয়ানক দাঙ্গা হাঙ্গামা!

এক ধর্মের মানুষ আর এক ধর্মের মানুষকে ঘরছাড়া, ভিটেহারা করবার জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছিল। হার মানিয়েছিল নখ-দাঁতওয়ালা জানোয়ারগুলোকেও। বাঘ, সিংহ, হায়না, নেকড়ে—তারা হরিণ খরগোশের টুঁটি ছেড়ে। গরু-ভেড়ার ঘাড় ভেঙে রক্ত খায়, মাংস খায়। কিন্তু অমন করে বন-পাড়ায় তারা আগুন লাগায় না। পড়শী প্রতিবেশীদের তারাও তাড়ায় না এমন করে! বন থেকে বনান্তরে।

নমাজ, পুজোর জ্ঞানগম্যি না থাকলেও ওরাও হয়তো জানে—জাত-ধর্ম ভাষা আর বাসার ভেদটা হিংসার হাতিয়ার নয়। হয়তো জানে পৃথিবীর জল-হাওয়া মাটিতে যারা ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে,

তাদের সবার জীবন একই বিধাতার সৃষ্টি। জানতো হয়তো মানুষরাও, কিন্তু ঐ দাঙ্গার সময়, তাদের সেই কাণ্ডজ্ঞানটাই লোপ পেয়েছিল ষোলআনা।

অমনি একদল ভয়ঙ্কর মানুষ-জানোয়ারের তাড়া খেয়ে দেশ-ছাড়া হয়েছে তিনটি মানুষ। আরও লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে!

পাঁচ বছর আগের সেই দাঙ্গাহাঙ্গামার ঘূর্ণিঝড়ে উড়ে এসে পড়েছে নরম পালকের মতো দুটি শিশু—দুখু, লখু! আর তাদের ষাট বছরের বুড়ি ঠাকুরমা। পড়েছে এসে ভাগকরা দেশের একভাগ থেকে আর এক ভাগে।

বাস্তুহারা! খসে-পড়া পালক তারা। দুঃখ-দুর্দশার ঝড় ঝাপটায় উড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। ঠাঁই-নাড়া করে তাদের কখনও ফেলেছে এখানে, কখনও সেখানে। এক উদ্বাস্তু-শিবির থেকে আর এক উদ্বাস্তু-শিবিরে। পাঁচটা বছর কেটেছে এমনি করেই।

পাঁচ বছর পরে। ওরা উড়তে উড়তে নড়তে নড়তে এসে পড়েছে নাম-করা এক শহর থেকে বিশ মাইল দূরে। সরকারী উদ্বাস্তু-শিবিরের এক ধারে। দুখুর বয়স এখন দশ। লখুর ছয়। হিসেব মতো ষাটের সঙ্গে পাঁচ যোগ করলে ঠাকুরমার বয়স পঁয়ষট্টি হয়। কিন্তু বুড়ি যেন বিপাকে পড়ে, পাঁচ বছরেই পঁচাত্তরের পাকানো দড়িটি।

কবরের কালো চাদরের মতো সন্ধ্যার অন্ধকার চাপা পড়েছে উদ্বাস্তু বসতিটার ওপর। বসে-পড়া ক্লান্ত উটের কুঁজের মতো কালো কালো তাঁবুগুলো। লণ্ঠন, পিদিম বা সন্তজ্বালানো উনুন-

গুলো জ্বলছে চারধারে। অন্ধকারের ছোট বড়ো জ্বলজ্বলে চোখের মতো।

কাঁটাতারের বেড়ার পাশে দুখু, লখুদের তাঁবুঘর। মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলছে একচক্ষু ভুসো-পড়া ভাঙা লণ্ঠনটা। ফাটা-চিমনির ফাটল গলে হাওয়ার দৌরাত্ম্যি। হাওয়ার তাড়ায় আলোর শিখাটা কাঁপছে। কাঁপন-লাগা সেই আলোতেই ছেঁড়া কালো তাঁবুর ভেতরকার দৈন্য-দশা বে-আবরু, দেখা যাচ্ছে আবছা-আবছা। ছেঁড়া কাঁথা, কুড়োনো ঝুড়ি, ভাঙা-তোবড়ানো হাঁড়িকুড়ি, টিন, ক্যানেস্তারা, সবাই যেন হাসছে দাঁত বের করে। চেঁচিয়ে যেন বলছে ওরা, ওখানে যারা বাস করে তারা কত গরিব! কত দীন!

চারপাশের ঐ দৈন্য-দীনতাকে কোণঠাসা করেছে ছোট্ট ফুট্‌ফুটে একটা খুকু, ছ' বছরের লখু। চাঁদের মতো কচি মুখে চিক্‌চিকে চোখের জোছনা মাখানো। পুতুল-খেলায় মেতে আছে সে। রঙ-চটা, ঠ্যাঙ্‌-ভাঙা একটা কাঠের ঘোড়া। মুণ্ডুভাঙা একটা মাটির সেপাই। পেট থেকে তুলো-বেরিয়ে-পড়া কাদা-মাখা একটা হাতি। ওরা লখুর খেলার সাথী। খুব সম্ভব লখু ওদের কুড়িয়ে এনেছে, আঁস্তাকুড় কিংবা রাস্তা থেকেই। আপন মনে লখু সেগুলোকে নেড়ে-চেড়ে খেলছে। তেলছাড়া রুক্ষ কোঁকড়া চুলঢাকা ঝাঁকড়া মাথাটা নড়ছে। গুন্‌গুন্‌ করে লখু ভাঁজছে ছড়ার সুর। দুখুর সামনে মলাট-ছেঁড়া ইতিহাসের বইটা খোলা। সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ছে······

"বিদেশী শাসকেরা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করিবার সিদ্ধান্ত করিল। ইহার ফলে সারা দেশে, দিকে দিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, খুন-জখম, অগ্নিকাণ্ড

ও লুঠতরাজ আরম্ভ হইয়া গেল। হাজার হাজার লোকের মৃত্যু ঘটিল। অসংখ্য নরনারী তাহাদের পতি-পত্নী ও সন্তানাদি হারাইল। সেই অরাজকতা ও হাঙ্গামার মধ্যে বহু বালক-বালিকা পিতামাতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। পরিবার-প্রিয়জন কে কোথায় ছিটকাইয়া পড়িল, তাহার খোঁজ রহিল না। লক্ষ লক্ষ নরনারী উত্তেজনা ও ভয়ে সাম্প্রদায়িক নিরাপত্তা এবং দলবদ্ধ হওয়ার জন্য পাগলের মতো অজানা অচেনা পথে দৌড়াইল। সেই মর্মন্তুদ ঘটনাবলীর ভয়ঙ্কর চিত্র আজও হয়তো তাহাদের চোখে ও স্বপ্নে জীবন্ত রহিয়াছে। যাহারা ঐ বিপর্যয়ের আঘাত সবচেয়ে বেশী সহ্য করিয়াছে······"

সঙ্গে সঙ্গে তুখুর চোখ ধাঁধিয়ে তার স্মরণশক্তি হঠাৎ যেন ঝলসে উঠলো। বইটা বন্ধ করে তুখু ঘেমে উঠলো। গলায় আটকে গেল বইয়ের পড়া। আর সে পড়তে পারলো না। তুখুর কালো ভুরু জোড়া শিউরে উঠলো। কপাল কুঁচকিয়ে বন্ধ করলে চোখ তুটোও।

চোখ বুজতেই মনের পর্দায় ভেসে উঠলো পাঁচবছর আগের আরও ছোট্ট তুখুর-দেখা আবছা আবছা কয়েকটা ঘটনার ছবি। হুড়মুড় করে তারা যেন তুখুকে ঘিরে ধরলে চারপাশ থেকে।

সে চোখ বুজেই স্পষ্ট দেখছে—তার বুড়ি ঠাকুরমা রাতের গহন আঁধারে একটা জলমরা নদী পেরুচ্ছে। হাঁটুর কাপড় তুলে তুখুকে কাঁধে চড়িয়ে। তাদের চারপাশে নাচছে লক্‌লকে আগুনের শিখা। ঘরবাড়ি পুড়ছে দাউ দাউ করে। আকাশে বাতাসে বুকভাঙা হাহাকার। ভয়-পাওয়ানো হিংসা মারামারির খুন্‌চাপা বীভৎস

চিৎকার! চোখ বুজে এতদিন পরেও দুখু যেন স্পষ্ট দেখছে, স্পষ্ট শুনছে। প্রথমটা ভয়ে সে বোবাই হয়ে গেছল। তারপরে হঠাৎ গুমরে গুমরে মনে মনেই কেঁদে উঠল। চোখ দিয়ে বেরুলো না এক ফোঁটা জল! আবার দুখু চোখ বুজলো।

দুখু যে পড়া থামিয়েছে লখুর কান সেটা টের পেয়েছে আগেই। তবে চোখ নড়াতে পারেনি খেলা থেকে। অতক্ষণ পড়া থামিয়ে দাদা অমন চুপ করে রয়েছে দেখে পুতুলে চোখ রেখেই লখু রীতিমত শাসনের সুরে বললে—"এই দাদাভাই! পড়া থামালি কেন রে! এরই মধ্যে ঘুমে ধরলো? ব্যাপার তো ভালো নয়!"

দুখু চোখ বুজেই জবাব দিলে,—"নারে লখু, স্বপ্ন দেখছি।"

লখু পুতুল ফেলে, হামাগুড়ি দিয়ে হাজির হ'লো দুখুর সামনে। চোখ ঘুরিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বললে—"এ্যাঁ! জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছিস্।" খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো সে—"একেবারে মিথ্যে কথা!"

দুখু ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকালো! বললে—"মিথ্যে নয়, সত্যি।"

লখুর কৌতূহল এবার আরও বাড়লো। বললে—"বেশ! বল তাহ'লে আমাকে, কী স্বপ্ন দেখছিলি?"

একটা মস্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মাথা নাড়িয়ে দুখু বললে—"না, ঠাকুমা জানতে পারলে রাগ করবে।"

লখুর রাগ বেড়ে উঠলো। দুখুর সামনে, হাঁটুতে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে বসেছে সে তখন। চড়া সুরে বললে—"জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছিস তুই; ঠাকুমা জানবে কী করে? ঠাকুমা তো নেই এখন?"

দুখু মুখ ঘুরিয়ে বললে—"ঠাকুমা জানে, ভাল করেই জানে এ স্বপ্নের কথা।"

লখু এবার পা-মুড়ে শক্ত হয়ে বসলো। চোখ পাকিয়ে প্রশ্ন করলে—"ঠাকুমা জানে, তুমি জানো—আমিই বা জানবো না কেন স্বপ্নগুলো?"

লখুর কোঁকড়া চুলগুলো নাড়িয়ে আদরের সুরে দুখু বললে—"না ভাই, না! তোর জেনে কাজ নেই। তুই ছেলেমানুষ, খেলা নিয়েই থাক।" বলতে বলতে, এতক্ষণের চাপা-কান্না উথলে পড়লো দুখুর চোখের কোল বেয়ে।

"বুঝেছি, ওঃ, স্বপ্নগুলোই তোকে কাঁদাচ্ছে তাহ'লে? তুই বরং পড় না কেন!" বলেই লখু তাড়াতাড়ি ইতিহাসের বইটার আর একটা পাতা খুললে। তুলে ধরলে দুখুর চোখের সামনে। বইয়ের যে-পাতাটা খুললো সে,—সেটা অবিভক্ত ভারতের মানচিত্র।

সঙ্গে সঙ্গে দুখুর জলভরা ঝাপসা চোখে ভেসে উঠলো আরও ভয়ঙ্কর একটা ছবি। দুখুর মনে হলো—একটা ভয়-পাওয়ানো ছায়ামূর্তি ভারতবর্ষের দেহটাকে মস্ত ছোরা বিঁধিয়ে কাটছে। গল্‌গল্‌ করে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত! শিউরে উঠলো দুখু—ভয়ে লখুর হাতের বইটা ঠেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো সে—"বন্ধ কর, বন্ধ কর! ও বই আমি পড়বো না। পড়তে পারবো না! ইতিহাস বড় ভয়ঙ্কর।"

লখু রীতিমত ঘাবড়ে গেল। বইটা ফেলে দিয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে—"তাই নাকি রে! তাহ'লে আর কখ্‌খনো পড়িস্‌ না ও বই। তার চেয়ে আমার সঙ্গে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ছড়া পড়।

এই ছড়াটা খুব ভালো রে দাদা ? খুব মজার !" বলেই লখু শুরু করলে—

"তেলের শিশি ভাঙলো বলে
খুকুর 'পরে রাগ করো ?
তোমরা যে সব বুড়ো-খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো ?
তার বেলা !"

চোখের জল মুছে দুখু চঞ্চল হয়ে উঠে পড়লো। বললে—"খুব ভালো, খুব ভালো তোর ছড়া ! আচ্ছা, ঠাকুরমা এখনও ফিরলো না ! বলতো কোথায় গেছে ?"

লখু একটু ভেবে বললে—"খুব সম্ভব ইস্টিশানের ধারে রায়বাহাদুরদের বাড়ি। ঠাকুরমা বলছিল, ওঁরা নাকি খুব বড়লোক !"

দুখু ঘরের একপাশে রাখা চরখাটা টানতে টানতে বললে—"হুঁ! বুঝেছি।"

দুই

উদ্বাস্তু বসতির কাঁটা-তার-দেওয়া সীমানার বাইরে। বনজবার বেড়া-ঘেরা ছোট্ট রেল স্টেশন। স্টেশনটার পশ্চিমে মস্ত একটা পাঁচিলঘেরা বাগান-বাড়ি। বাড়ির মালিক ইংরেজ-আমলের খেতাব-পাওয়া বড়লোক। রায় বাহাদুর মোহন সিংহ। শহরে মস্ত ব্যবসা। বাড়ি, গাড়ি সবই আছে সেখানে। তবে মাঝে মাঝে বাগান-

বাড়িতেও আসেন। ওখানেই দু' চার মাস কাটান। মোটর চড়ে রোজই তখন তিনি শহরে যান আর আসেন।

ভোট-যুদ্ধে নামবেন বলে উদ্বাস্তু-দরদী হয়ে তিনি সম্প্রতি শহর ছেড়ে ওখানে এসে বাস করছেন। রাজনীতির কারবার করবেন উদ্বাস্তুদের রকমারি ফন্দির বস্তায় বস্তাবন্দী করে।

দুখুর ঠাকুরমার মাথাতেও ফন্দি ঘোরে। মাঝে মাঝে মনটাও কেমন করে ওঠে। বুড়ি তখন চুপ করে বসে থাকতে পারে না। ছোটে এখানে সেখানে। স্টেশনে যায়, সন্ধ্যার অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে। ডেলি প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে পয়সা চাইবার মতলবেই যায়। হাত পেতে চাইতে পারে না আর পাঁচজন উদ্বাস্তুর মতো। কোন অদৃশ্য হাত যেন তার হাত ঠেলে সরিয়ে দেয়, গলাটা টিপে ধরে। চাইতে না পেরে ফিরে আসে।

সেদিনও গেছলো বুড়ি সেই মতলবেই স্টেশনে। কিন্তু প্যাসেঞ্জার-ভর্তি ট্রেনটা যখন এলো শহরের দিক থেকে, তখন বুড়ি সেদিকে আর চোখ ফেরাতেই পারলো না। অনেক দিন পরে চোখে ভেসে উঠলো স্বর্গবাসী জমিদার-স্বামীর পাকানো চোখ দুটো! ছুটে গিয়ে দাঁড়ালো স্টেশনের বাইরে। একগলা ঘোমটা টেনে ফটকটার ধারে। টলতে টলতে অন্ধকার রাস্তার একটা গাছের আড়ালে গিয়ে বুড়ি হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো।

রায় বাহাদুর-গিন্নী শহর থেকে ফিরছিলেন। ট্রেন থেকে নেমেই তিনি ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিলেন। রাস্তায় পা বাড়াতেই তিনি কান্না শুনে বুড়ির কাছে এগিয়ে গেলেন। বললেন—"কী হয়েছে গা? কাঁদছো কেন অমন করে?"

বুড়ি আরও জোরে কেঁদে উঠলো। ছেলেমানুষের মতো বলল—"ভিক্ষা করনের লাইগ্যা রোজই আইতে আছি। পারতে আছি না মা।"

রায় বাহাদুর-গিন্নীর মনটা কেমন ভিজে উঠলো। বুড়ির হাত ধরে বললেন—"বুঝেছি মা! সবাই কি ভিক্ষে করতে পারে! আসুন আপনি আমার সঙ্গে।"

খানিক বুড়ি তাকিয়ে রইল ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে। তারপরে আপনার মনেই বলে উঠলো—"যামু মা যামু, তোমারে সব কমু। আমাগো দুঃখের কথা কেউ আর শোনতে চায় না।"

"আমি শুনবো মা, চলুন আপনি আমার সঙ্গে।" বুড়িকে যত্ন করে হাত ধরে নিয়ে এগিয়ে চললেন রায় বাহাদুর-গিন্নী।

রায় বাহাদুরের বাগান-বাড়ির রেলিংঘেরা বারান্দায় মেঝের উপর উবু হয়ে বসেছে বুড়ি জড়োসড়ো পুঁটলির মতো। রায় বাহাদুর গৃহিণীর দেহ হেলানো একটা চেয়ারে। শুনছিলেন তিনি বুড়ির দুঃখের কাহিনী। কাহিনীর গোড়ার পর্বটুকু শুনেই সিংহ-গৃহিণীর মোটা শরীরটা দুলে উঠলো। রাগে যেন ফুলে উঠলো তাঁর গলাটা। বিরক্তির বেয়াড়া সুরে বললেন—"ওমা! কী ভয়ঙ্কর কথা! আপনার ছেলে-বৌয়ের উচিত হয়নি অমনি করে বিপদের মুখে আপনাকে একলা ফেলে চলে যাওয়া!"

বুড়ি থতমত খেয়ে বললে—"তাগো কোন উপায় ছিল না মা। অরা দুইজনেই স্বদেশী করছে, জেল খাটছে। অন্যেরে বাচানের জন্য অরা তখন দিনরাত্র ছুটাছুটি করতে আছিল মা।"

"বুঝলুম। অন্যের উপকার করবার জন্যে ঐ-সব বাড়াবাড়ি

আদিখ্যেতা আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। আপনারও উচিত ছিল, তাদের শাসন করা, ধিক্কার দেওয়া।"

"কেম্‌নে তা করুম মা? আমিই তাগো দ্যাশের কাম করনের লাইগা তাগিদ দিছি। অখনঅ আমি তাগো দোষ দেখি না!" বললে বুড়ি সোজা হয়ে বসে।

রায় বাহাদুরের স্ত্রী চেয়ারে নড়ে বসলেন। বললেন—"আপনি দোষ না দেখলেও সবাই তাদের দোষ দেবে। আপনার লেখাপড়া জানা ছেলে-বৌ যে একেবারে দায়িত্বহীন নির্মম তাতে কোন সন্দেহ নেই। তা না হ'লে এই লম্বা পাঁচটা বছরের মধ্যে আপনার তারা খোঁজ খবর নিতে পারলে না!"

ছেলে-বৌয়ের সম্পর্কে এমন রূঢ় মন্তব্য শুনে বুড়ি কান্না-কাঁপা গলায় ভয়ে ভয়ে জবাব দিলে—"ওরা অয়তো বাইচ্যা নাই মা? বাছারা আমার, বাইচ্যা যদি থাকতো, আইতো মা, নিচ্চয় আইতো।" বলেই বুড়ি আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

রায় বাহাদুর গৃহিণী অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। চেয়ারে নড়ে উঠে বুড়িকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—"কেঁদে তো লাভ নেই মা, আপনি কাঁদবেন না।"

বুড়ি তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছে জবাব দিলে—"কান্দবার আমার জো নাই। আমি কান্দি না মা। কান্দলে আমার দুখু-লখু কান্দবো যে?"

রায় বাহাদুর গৃহিণী চমকে উঠলেন। প্রশ্ন করলেন—"দুখু-লখু! তারা কে? আপনার নাতি-নাতনী বুঝি?"

বুড়ির একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়লো, শর শর করে নড়ে উঠলো,

বাইরে গাছের পাতা। জল-চকচকে চোখ মুছে বললে—"অরা ? অরা আমার দুই চক্ষুর দুই মণি !"

রায় বাহাদুর গৃহিণীর মুখেও মাপা হাসির ঝিলিক খেলে গেল—"বুঝেছি। তা নয়নের মণি দুটিকে আনেননি কেন সঙ্গে ?"

"আনুম কেম্‌নে মা ? আমি আইছিলাম ভিক্ষা করতে। অরা ভিক্ষা করন পছন্দ করে না। কয়—আমরা ভিক্ষুক না।"

"তাই নাকি! ওদের দুজনকে আমার ভারি দেখতে ইচ্ছে করছে। আচ্ছা ওদের বয়স কতো ?" অবাক-খুশির চোখে প্রশ্ন করলেন রায় বাহাদুর-গিন্নী।

বুড়ি খানিকটা সামলে নিতে পেরেছে নিজেকে এতক্ষণে। কোঁচকানো চামড়া-ঢাকা বাঁকা বাঁকা আঙুলের গাঁট গুনতে গুনতে বুড়ি হিসেব করলে। ভেবে ভেবে জবাব দিলে—"পাঁচ বছর আগে এখানে যখন আইয়া পৌঁছলাম দুখুডার বয়স তখন পাঁচ আর লখু হইবো এক বছরের মতো। হেইলে দুখুর হইব অখন দশ, আর লখুর ছয়।"

"কী আশ্চর্য !" বললেন রায় বাহাদুর গিন্নী, "আমারও দুটি ছেলেমেয়ে, তাদেরও ঐ একই বয়স। ইচ্ছে হচ্ছে আমার ছেলে-মেয়ের সঙ্গে আপনার নাতি-নাতনীদের ভাব করিয়ে দিই।"

"ইচ্ছা তো আমারও হয়। এডাতো আমার আর নাতি-নাতিনের মহাভাগ্য। কিন্তু মা, আমার ভয়, তোমাগো বাড়িতে আইতে তাগো লজ্জা করবো।" বললে বুড়ি বেশ চিন্তিত হয়েই।

"বুঝেছি, বাঁকা কথা শুনে পাছে আমার ছেলেমেয়ে হাসে, এই ভয়ে ?"

"না মা না, দুখু-লখু অখন পরিষ্কার তোমাগো দ্যাশের ভাষায় কথা কয়। আপন দ্যাশের ভাষা এক্কেবারে ভোলছে।"

"তবে আসবে না কেন?"

"লজ্জা করবো, ছিরা জামা কাপড়ের লাইগ্যা।" বলেই বুড়ি ঘাড় হেঁট করলো।

"এই কথা! ওর জন্যে মন খারাপ করবেন না। আমি এখনই দিচ্ছি ওদের জামা কাপড়।" বলেই রায় বাহাদুর গৃহিণী পর্দা ঠেলে ভেতরে গেলেন।

বুড়ি বলে উঠলো—"ভগবান আপনারে সুখ ঢাইল্যা দিন, ছাওয়ালপানরে মঙ্গলে রাখুন।"

বুড়ি ফিরছে না দেখে, অমঙ্গলের আশঙ্কায় দুখুর বুকটা কাঁপছে। কাঁপছে অন্ধকারে তেল-কমে-আসা ভুসো-পড়া লণ্ঠনের শিখাটাও। পড়াশুনো শিকেয় তুলে রেখে দুখু চরখায় সুতো কাটছে। চরখার গর্জন দিয়ে তাঁবুর নির্জনতার ভয়টাকে তাড়িয়েছে।

লখুও তক্‌লি ঘুরিয়ে সুতোর পাক দিচ্ছে। আর মনে মনে মতলব পাকাচ্ছে। ঠাকুরমা ফিরে এলে দাদার কাণ্ডকারখানা সব বলে দেবে।

সুতো কাটতে কাটতে হঠাৎ দুখু বলে উঠলো—"দেখ লখু, কি রকম জোরে আমি সুতো কাটছি। আচ্ছা বলতো, এই ক'দিনে যা সুতো কেটেছি, তাতে তিনজনের কাপড় জামা হবে না?"

লখু গম্ভীর গলায় জবাব দিলে—"হতে পারে, যদি তুই আমার সুতোটাও জুড়ে দিস তোর সুতোর সঙ্গে।"

দুখু সুতো কাটতে কাটতে বললে—"লখু তুই কী শয়তান রে!

ফাঁকি দিয়েই আমার বাহাদুরীর ভাগ নিতে চাস? বেশ! তাহ'লে আরও বেশী করে রোজ সুতো কাট।"

ঠিক তেমন সময় ওদের বুড়ি ঠাকুরমা ঢুকলো এসে তাঁবুর ভেতর। দুখু আড়চোখে দেখলে, ঠাকুরমার শাড়ির আঁচলের নীচে একটা যেন পোঁটলা লুকোনো।

ঠাকুরমা ঘরে ঢুকেই চেঁচাতে শুরু করলেন—"হায় আমার পোরাকপাল! লেখা-পরা ছাইর‍্যা সুতা কাটতে লাগছো কোন্ কম্মে? অখন হগলেই যখন সুতা কাটতে অস্বীকার করছে তখন সুতা কাটতে বইছো কিসের লাইগ্যা? সুতা তোমার কোন কম্মে লাগবো শুনি?"

দুখু গম্ভীরভাবে জবাব দিলে—"লাগবে অনেক কাজে। নিজেদের জামা-কাপড় নিজেদের সুতোতেই হবে। বেশী কাটলে পয়সাও পাওয়া যাবে।"

বুড়ি ঠাকুরমা আরও জ্বলে উঠলেন। ভাঙা-কোমর সোজা করে চেঁচিয়ে জবাব দিলেন—"তর মাথা ঘামান লাগবো না, যতক্ষণ তর ঠাকুমায় বাইচ্যা আছে। এই দেখ, কত সুন্দর জামা!" বলেই বুড়ি আঁচলের তলা থেকে খবরের কাগজ-জড়ানো পুঁটলিটা থেকে একটা সিল্কের শার্ট আর একটা সাটিনের ফ্রক বার করলেন। ছুঁড়ে দিলেন সেগুলো দুখু-লখুর দিকে।

লখু তকলিটা পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লাফিয়ে উঠলো। চকচকে সাটিনের ফ্রকটা কুড়িয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি নিজের গায়ের সঙ্গে মেপে দেখে নিলে। আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো—"ভারি চমৎকার, খুব সুন্দর জামারে দাদা?"

দুখু রাগে কাঁপতে কাঁপতে ঠাকুরমার দিকে শার্টটা ছুঁড়ে দিয়ে

দাঁড়িয়ে উঠলো। বললে—"বোকার মত কী বলছিস লখু? এগুলো অন্যের-পরা, পুরনো! বিলিতী কাপড়ের তৈরী!" একটু থেমে, কান্না-কাঁপা অভিমানে বলে উঠলো—"ঠাকুরমা! তুমি এগুলো ভিক্ষে করে এনেছ? আমরা ঐ ভিক্ষে-করা জিনিস ছোঁব না। আমরা ভিখারী নই!"

দুখুর ভাবগতিক দেখে লখুও ঘাবড়ে গেল। সেও দুখুর দেখা-দেখি তাড়াতাড়ি ফ্রকটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দুখুর গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। বললে—"দাদার কথাই ঠিক ঠাকুরমা।"

বুড়ি ঠাকুরমাও কেমন যেন দিশেহারা। ওদের কথা শুনে বোকা চোখ করে ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন—"হ! হ! তরাই ঠিক কইছস। আমারই ভুল হইছে। ক্যান্ আমি ভিক্ষা করুম! আমার সোয়ামী জমিদার, আমার পোলা সাত রাজার ধন এক মানিক।" বলতে বলতে ঠাকুরমা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

লখু আর স্থির থাকতে পারলে না। দৌড়ে গিয়ে ঠাকুরমাকে জড়িয়ে ধরে ব্যাকুল আগ্রহে জিজ্ঞেস করলে—"ওঁরা কোথায় ঠাকুরমা? তুমি আমাদের নিয়ে যেতে পার না তাঁদের কাছে?"

বুড়ি ঠাকুরমা লখুর কথার কোনও জবাব খুঁজে পেলেন না। জলভরা চোখে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে বার বার তাকাতে লাগলেন দুখুর দিকে।

ব্যাপারটা সামলে নিয়ে দুখুই জবাব দিলে লখুকে—"কেমন করে ঠাকুরমা পারবে বল্? মস্ত একটা ঝগড়া বেধে বসে আছে যে!"

লখু ফোঁস করে উঠলো—"মুখ সামলে কথা বলবি দাদা—ঝগড়া বাধিয়েছে ঠাকুরমা? কখ্খনও না।"

বুড়ি ঠাকুরমা চোখ মুছতে মুছতে উঠে পড়লেন, বললেন—"দুখু ঠিকই কইছে রে দিদি, খাটি কথা কইছে! মস্ত একটা ঝগড়ার লাইগ্যাই তো সব সম্পর্ক ঘোচছে।"

দুখুর চোখ দিয়ে আবার হু-হু করে জল নেমে এল। পাছে লখু দেখতে পায়, তাই সে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে চোখ বুজলো। আবার তার কানে প্রতিধ্বনিত হলো—পাঁচ বছর আগের সেই মস্ত ঝগড়ার বীভৎস চিৎকার! মত্ত কোলাহল!

তিন

কোলাহল, চিৎকার, ঝগড়া, মারামারির ফলেই দেশ ছাড়তে হয়েছে বটে, কিন্তু ওগুলো তারা ছাড়তে পারেনি অনেকেই। তাই সেদিন, প্রত্যেক দিনের মতোই তুমুল ঝগড়া বেধে উঠেছে উদ্বাস্তু শিবিরের একধারে।

কথা-কাটাকাটি, গালাগালির চাপা গোলমাল ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছিল, কে যেন চড়া স্বরে বেশ স্পষ্ট করে বলছে—"পাড়া-প্রতিবেশীর ঝগড়া মারামারির ফলেই সর্বস্ব খুইয়েছেন, তবু সেটাকেই আঁকড়ে রয়েছেন? আপনারা কি বোঝেন না যে, আপনাদের ঝগড়া-মারামারির বয়স পেরিয়েছে! আপনারা অনেকেই রীতিমত ছেলেমেয়ের মা-বাবা।"

শুনছে আর গজরাচ্ছে একদল বয়স্ক মেয়ে-পুরুষ। তাদের কারুর হাতে ঝাঁটা, কারুর হাতে ছাতা, লাঠি। কেউবা হাতা-খুন্তি নিয়েই তেড়ে এসেছে। বেশ জমাট একটা রেগে-ওঠা গরম ভিড়। মা-বাবার ঝগড়ার মজা উপভোগ করবার

লোভে, কচি-কাঁচা ছেলেমেয়েরাও দল ভারী করে জুটে গেছে চারধারে।

ভিড়ের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছেন, দারোগার মতো খাকি পোশাক-পরা, লম্বা-চওড়া এক সুপুরুষ। মাথায় কাঁচা-পাকা কেয়ারী করা চুল। পাকানো গোঁফ, চোখে চোয়ালে দৃঢ়তার ছাপ। ঝগড়া-মারামারি থামাতেই তিনি এসেছেন। এই-সবই তাঁর কাজ। তিনিই উদ্বাস্তু শিবিরের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। তাঁকে দেখে আর তার ভারিক্কী গলার ধমকানি খেয়েই গোলমালটার সুর নেমেছে। তবে তাঁর গলার সুর নামেনি। ধিক্কার দিয়ে তিনি বলে উঠলেন—"ছোট ছোট এইসব বাচ্চাদের সামনে কুকুর বেড়ালের মতো ঝগড়া মারামারি করতে আপনাদের লজ্জা করে না?"

তিরস্কার তীরের ফলার মতো ধারালো। খোঁচা খেয়ে সবাই মুখ থামালো, চোখ নামালো। গোলগাল মোটাসোটা একটি লোক এগিয়ে এল। বয়স হয়েছে পঞ্চাশের ওপর। থুৎনির ওপরকার কাঁচাপাকা ছাগল-দাড়িটি নাড়িয়ে খোশামোদের সুরে বললেন—"ঠিকই কইছেন হুজুর। আপনে এক্কেবারে হক্ কথা কইছেন।"

সঙ্গে সঙ্গে একটা খোঁচা খোঁচা গোঁফওয়ালা ষণ্ডামার্কা লোক ঠাট্টার সুরে চেঁচিয়ে উঠলে—"বাহবা ভাই, ছাগল-দাইড়্যা বাহাদুর!" চারপাশের লোকজন হো-হো করে হেসে উঠলো। ছেলেমেয়েগুলোও পট্ পট্ করে হাততালির পায়রা উড়িয়ে দিলে!

দাড়িওয়ালা মোটা লোকটার স্ত্রী ঐ ভিড়ের মধ্যে কোথায় ছিল। ঝাঁটা বাগিয়ে ভিড় ঠেলে সে তেড়ে গেল খোঁচা-গোঁফ-ওয়ালা লোকটার দিকে। ফাটা কাঁশির মতো গলা বাজিয়ে

চেঁচিয়ে উঠলো—"চুপ কর বেটা ঝাঁটা-মোচ, ঝাটাইয়া তোমার বিষ ঝারুম! চেননাই আমারে?"

সঙ্গে সঙ্গে নথ নেড়ে তেড়ে এলো ভিড়ের ভিতর থেকে আর একটি মহিলা মুখ বেঁকিয়ে, ভেংচি কেটে বললে—"কেডা না চেনে রে তোরে কুত্তি?"

"আমি কুত্তি আর তুই বিল্লী?" জবাব দিলে আগের মহিলাটি। সকলে হেসে উঠলো আবার।

ক্যাম্প-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁদের দিকে এগিয়ে গেলেন। জোড়হাত করে বলে উঠলেন—"না! না! আপনারা হলেন ভবিষ্যত জাতির মা। দয়া করে এটুকু বুঝুন, বুঝতে দিন আপনাদের ছেলেমেয়েদের। নিজেদের এমন করে খেলো না করে ওদের শ্রদ্ধা ভক্তি পাওয়ার চেষ্টা করুন। আদর্শ মা হয়ে ওদের আদর্শ ছেলেমেয়ে করে তুলুন। মায়েদের কাছে আমার এই মিনতি।"

ভিড়-করা মায়ের দল লজ্জায় ঢিল-পড়া জলের মতো নড়ে চড়ে উঠলো।

দুজন বয়স্ক লোকের মাঝখান থেকে কোঁকড়াচুল-ঢাকা লখুর ঝাঁকড়া মাথাটা বেরিয়ে এলো। চোখ বড়ো বড়ো ক'রে বায়নার সুরে লখু বললে—"আমি খুব ভালো আর বড়ো একটা মা চাই। বড়ো মা, ভালো মা এসে আমাকে বড়ো করবে, ভালো করবে।"

লখুর কথা শুনে সবাই চমকে উঠলো। খপ করে বৃষ্টি নেমে যেন ঝপ করে ঝগড়া মারামারির আগুন দিলে নিভিয়ে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব হাত বাড়িয়ে লখুকে কোলে তুলে নিলেন। আদর করে তার গালে একটা চুমু দিয়ে বললেন চারপাশের

সবাইকে উদ্দেশ করে—"শুনলেন তো এই ছোট্ট খুকুটির মনের কথা? এরই মতো ছোটরা সবাই চায় বড় হতে, ভালো হতে, ভালো বাপ-মা পেতে।"

এসব দেখে শুনে উত্তেজনা থেমে গেল। সরেও গেল বেশ কিছু লোক। কেউ কেউ দাঁড়িয়ে রইল—লখুর দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে।

লখুর গাল টিপে আদর করে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট নাগ সাহেব চাপা গলায় বললেন—"মায়ের কাছে নিয়ে যেতে পারি, যদি তুমি আমার বাড়িতে গিয়ে থাকো।"

"বারে! আমি কেমন করে তোমার বাড়ি গিয়ে থাকবো? ঠাকুমা আর দাদা যে কাঁদবে! মা কেন আসবে না আমাদের কাছে?" বললে লখু, ঠোঁট ফুলিয়ে মাথা দুলিয়ে।

"বেশ! বেশ! মা-ই আসবে তোমাদের কাছে।" হেসে জবাব দিলেন সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সাহেব।

লখু চোখ দুটো ছোট করে ভাবনার ভারিক্কী ভঙ্গিতে বললে—"মা কী করে আসবে? মা তো আমাদের ঘর চেনে না!" বললে দূরে ওদের ঘরটার দিকে আঙুল দেখিয়ে। "তুমি বলে দিও, ঐ তেঁতুলতলার কাছে ৩৩নং তাঁবুটাতে আমরা থাকি।"

ঠিক সেই মুহূর্তে বেশ দূর থেকেই শোনা গেল দুখুর ডাক। দুখু চেঁচিয়ে ডাকছে—"লখু! লখু! লখু রে!"

যে দু'চারজন আশপাশে ছিল সবাই ফিরে তাকাল। চমকে উঠে লখুও সসব্যস্ত। হাত-পা ছুঁড়ে বললে—"দাদা ডাকছে! আমায় ছেড়ে দাও, নামিয়ে দাও কোল থেকে!"

সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সাহেব ছোট্ট খুকুটার অস্বস্তি বুঝতে পারলেন।

তার রাঙা গালে আবার একটা ছোট্ট চুমু দিয়ে কোল থেকে নামিয়ে দিলেন।

ছাড়া পেয়ে লখু ছুটলো পন পন করে। সোনালী চুলগুলো বাতাসে উড়িয়ে। চেঁচাতে লাগলো—"দাদারে! আমাদের মা আসবে। মাকে আমরা ফিরে পাবোরে।"

সবাই অবাক লখুর কাণ্ড দেখে। ছেলে-বুড়ো কারুর মুখ দিয়ে আর কথা বেরুলো না। যে-যার ঘরের দিকে চললো, লখুর তুলিয়ে দেওয়া মনের তুলুনি নিয়ে।

লখু চোখের আড়ালে চলে যেতেই সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সাহেব পা বাড়ালেন। মস্ত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রুমাল দিয়ে চোখ মুছে দরদের কান্না লুকিয়ে রাখলেন।

অনেক কান্না লুকিয়েছেন—পাঁচ বছর ধরে মায়া দেবী। কান্না লুকিয়ে লুকিয়ে সেদিন তাঁর বুকের ভেতর কান্নার সাগর উপছে পড়ছে। তার ছোট্ট সাজানো-গোছানো ঘরটাও তাই যেন থম্‌থম্‌ করছে। মায়ার স্বামী নরেন চৌধুরী মশাই মুখ বুজে শুনছিলেন তাঁর স্ত্রীর ফোঁপানো কান্না। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে মায়া বললে—"তুমি তোমার মা-ছেলে কাউকেই পাবে না ফিরে। পাওয়া তোমার উচিতও নয়।"

নরেন চৌধুরী চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন ব্যস্ত হয়ে। জিজ্ঞেস করলেন—"হঠাৎ আজ এমন উতলা হলে কেন? কিসের তোমার এত হতাশা?"

মায়া জলভরা চোখে রাগে ফুলে উঠলো—"হতাশা ছাড়া আর

আমার আছে কী ! পাগল ! আস্ত পাগল তুমি ! তোমার সঙ্গে ঘর করে বুঝতে আর সেটা বাকি নেই।”

নরেন হেসে জবাব দিলেন—“সত্যিই আমি পাগল মায়া। পাগল না হয়ে উপায় কি ? দেশের মানুষগুলোর দুর্দশা আর দুঃখ কষ্টই আমাকে পাগল করে তুলেছে।”

মায়া কেঁদে ফুলতে ফুলতে জবাব দিলে—“নিজের স্ত্রী ছাড়া আর সবাইয়ের দুঃখই তোমাকে পাগল করে ! বোঝ না শুধু আমার দুঃখ ! আমার কষ্ট !” একটু থেমে উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করলে মায়া—“আশ্চর্য ! সরকারী দপ্তরে নামকরা সব তোমার বন্ধু-বান্ধব এতো। রোজ সেখানে যাচ্ছো আসছো, তবু পারলে না তুমি আমার সুখরঞ্জন আর তোমার মায়ের খোঁজটুকু বার করতে ?”

“পারবো, পারবো।, খুব শিগ্‌গিরী হয়তো ওদের আমি খুঁজে বার করতে পারবো। তবে আরও সেটা সহজ হতো, যদি ওদের দুজনের ফটো থাকতো দুখানা।” বললেন নরেনবাবু, ঘরে পায়চারি করতে করতে।

মায়া দৌড়ে গিয়ে নরেনকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো কেঁদে উঠলো,—“নাইবা থাকলো ফটো ! আমার বুকের ভেতর জ্বল জ্বল করছে ওদের ছবি। আমি দেখাবোগো বুক চিরে !”

নরেন মায়ার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—“শান্ত হও মায়া ! শান্ত হও, পাগলামী করে লাভ নেই !”

চার

উদ্বাস্তু বসতির উত্তরদিকের বুড়ো আমগাছটার তলায় দুখু দাঁড়িয়েছিল। লখুকে অমন চিৎকার করে সেদিকে ছুটে আসতে দেখে জুটে গেল আশপাশের আরও পাঁচ-সাতটা ছেলে-মেয়ে। লখু দৌড়ে এসে দাদাকে জড়িয়ে ধরলে পাগলের মতো। এক-নিঃশ্বাসে বলে গেল—ক্যাম্প-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যা যা বলেছে সব কথা। 'মা আসবে, মাকে ফিরে পাবে তারা', সে-আনন্দের উত্তেজনায় লখুর চোখ দুটো জ্বলছে। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস পড়ছে। দুখু তবু কেমন যেন গম্ভীর স্থির! লখুর অত কথার জবাবে একটিও কথা বললে না সে!

ন' দশ বছরের ছেলে রামু। সে-ই ঝট করে বলে বসলো—"পাগলামি করিস না লখু। সুপারিনটেন সাহেবের কথা কম কওনই ভালো। আমাগো সে একটা ফুটবল দিবার পারে না! আর সে আইন্যা দিব তর মায়েরে? আমি বিশ্বাস করি না ওরে একটুকু। ওটা একটা মস্ত ধাপ্পাবাজ।"

রামুর ছোট মুখে বড় কথা! শুনে দুখুর মুখখানা আরও গম্ভীর হয়ে উঠলো। ভারী গলায় বললে সে—"রামু বাজে কথা বলিস না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবতো অনেকবার আমাদের বল দিয়েছেন। কিন্তু সেগুলো আমরাই কেউ না কেউ চুরি করেছি, নয়তো বেচে দিয়েছি। আমরা নিজেরাই অসৎ, মিথ্যুক, চোর হচ্ছি, আর দোষ দিচ্ছি তাঁকে!"

লখু এতক্ষণে একটু জোর পেয়েছে। "দাদা ঠিক বলেছে,

সুপারিনটেন সাহেব খুব ভালো লোক। কথা যখন দিয়েছে, নিশ্চয় মা এনে দেবে। মা এনে দিলে মাকেতো কেউ চুরি করতে পারবে না?" বললে লখু, রীতিমত মাথা ঝাঁকিয়ে চোখ পাকিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে ভজু বলে আর একটা ছেলে বললে—"পারে পারে মায়েরেও চুরি করতে পারে। এই মাত্তর আমি শুইনা আইলাম, বড়রা কইতে আছিল, নীলিমার মায়েরে কাইল রাতের থন খুইজ্যা পাওন যাইতেছে না। নিশ্চয় কেউ তেনারে চুরি কইরা লইয়া গেছে।"

দুখু রাগে জ্বলে উঠে, চেঁচিয়ে উঠলো—"বোকার মতো কথা বলিস না। ওসব কথায় আমাদের কাজ কি? বড়দের ঐসব বুড়োটে কথায় কান দেওয়া উচিত নয় আমাদের, বুঝলি বোকা?"

ভজু কোন জবাব দিলে না, লজ্জায় ঘাড় হেঁট করলে। মুখ তুলে জবাব দিলে গোপী বলে, ছেলেটা। দুখুর চেয়ে বয়সে সে বড়ো। রোগা লিকলিকে পাকানো চেহারাটা। চোখ দুটো কোটরে ঢোকা। ঠোঁট বেকিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে ঠাট্টার সুরে বললে সে—"বুঝেছি মশাই বুঝেছি! বরোগো যে তোমার ভয় কিসের আমি তার কারণডা জানি।"

দুখু ছুটে এসে গোপীর হাতটা চেপে ধরলে—গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলে—"বল কী কারণ?"

"কারণ বরোরাই তো কয়, তর মায়েরেও চোরে নিছে..."

গোপীর কথা শেষ হবার আগেই দুখু বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো গোপীর ঘাড়ে। গায়ের জোরে তাকে মাটিতে ফেলে এক হাতে তার গলাটা টিপে ধরল। দমাদম ঘুষি লাগাতে লাগলো গোপীর চোখে মুখে।

তাই না দেখে ঘাবড়ে গেল ছেলেমেয়ের দল। ছুটে পালালো যে যার আস্তানার দিকে। গোপী প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে তখন—"ওগো আমারে মাইরা ফেলালো, আমারে বাচাও। আমারে বাচাও।"

লখুও ভয় পেয়ে দুখুকে ছাড়িয়ে আনার জন্যে টানাটানি শুরু করলে—চেঁচাতে লাগলো—"দাদা ভাই! ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, মেরোনা ওকে। মাকে আসতে দাও, তখন আমরা দেখিয়ে দেবো, আসল মাকে চোরে নিতে পারে না। মা কখনও চুরি হয় না।"

ঠিক তেমন সময় দূর থেকে ক্যাম্প-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছুটে এলেন সেখানে। জোর করে দুখুকে জাপটে ধরে মারামারিটা ছাড়িয়ে দিলেন। ছাড়া পেয়েই গোপী ছুটলো পাঁই পাঁই করে।

দুখু তখনও রাগে ফুলছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—"ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন আমাকে দয়া করে। আমি ওকে মেরে শেষ করবো। ঐ রাস্কেলটা আমাকে কি বলেছে, আপনি শোনেননি?"

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নাগ সাহেব দুখুকে বুকে আরও চেপে ধরে, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সান্তনার সুরে বললেন—"সব শুনেছি আমি ছেলেদের কাছ থেকে। আমি ওকে ভয়ানক শাস্তি দেবো। তুমি এখন শান্ত হও বাবা।"

লখু চকচকে চোখ দুটো তুলে বললে—"মা যদি ফিরে আসে তাহ'লে দাদাভাই একদম ভালো হয়ে যাবে, শান্ত হয়ে যাবে।"

নাগ সাহেব হেসে হাত বাড়িয়ে লখুর হাতটা ধরে ফেললেন, বললেন—"বেশ তাই হবে, এখন চলো তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসি তোমাদের ঠাকুরমার কাছে।" পা বাড়ালেন ওদের এগিয়ে

দেওয়ার জন্যে। দুখু চোখ মুছে ব্যস্ত হয়ে বললো—"না! না! আপনি এখন যাবেন না স্যার! ঠাকুরমার পাগলামিটা এখন বড় বেড়েছে।"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব চমকে ঘুরে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন—"তোমরা তাহ'লে সেই বুড়ির নাতিনাতনী? যাকে, এখানে সবাই 'পাগল মা' বলে?"

লখু ঘাড় নেড়ে জবাব দিলে—"হ্যাঁ। ঠাকুরমা কিন্তু পাগল থাকে না। মাঝে মাঝে পাগল হয়। তাইতো আমাদের মা একটা চাই-ই চাই!"

নাগ সাহেব একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন, বললেন—"হুঁ! মা চাই বৈকি।" লখু ভারি খুশি। সে আঙুল দিয়ে দূরে একটা ফুলগাছ দেখালে। বললে—"তোমাকে আমি ফুল এনে দিই? তুমি আমাকে মা এনে দেবে ঠিক?"

"ঠিক!" বলে ঘাড় নাড়লেন নাগ সাহেব। লখু নাগ সাহেবের হাত ছাড়িয়ে ছুটলো ফুল আনতে।

নাগ সাহেব সুযোগ বুঝে হাঁটতে হাঁটতে দুখুকে জিজ্ঞেস করলেন—"আচ্ছা, তুমি জানো, কোথা থেকে তোমরা এখানে এসেছ? তোমার বাবার নাম কি?"

দুখু মাথা হেঁট করে জবাব দিলে—"কেমন করে জানবো! শুনেছি, বাবা-মা স্বদেশী করে বেড়াতেন। বাড়িতে বড় একটা থাকতেন না। পুলিশের ভয়ে দুজনেই পালিয়ে থাকতেন অধিকাংশ সময়ে।"

"হুঁ, এ ছাড়া তোমার আর কি মনে আছে?" জিজ্ঞেস করলেন নাগ সাহেব।

দুখু একটু ভেবে নিয়ে জবাব দিলে—"একটু একটু শুধু মনে পড়ে, শহরের স্টেশনে যখন আমরা এসে পৌঁছলাম, ঠাকুরমা তখন একেবারে আধা-পাগল। কিছু বললেন না, কোনও কথার জবাব দিলেন না—শুধু বলেছিলেন আমাদের দেখিয়ে, "ওরা আমার দুই চক্ষের দুই মণি।"

নাগ সাহেব থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, বললেন—"হ্যাঁ! হ্যাঁ! আমারও এখন মনে পড়ছে ঐ রকম একটা ঘটনার কথা। তখন শহরের ঐ স্টেশনেই আমার ডিউটি ছিল। আচ্ছা তোমার মনে পড়ে আমাকে? মনে পড়ে কি তোমাদের নাম জিজ্ঞেস করার পর তোমার ঠাকুরমা আমাকে কী জবাব দিয়েছিলেন?"

দুখু ঘাড় নেড়েই জানালে—না কিছুই তার মনে পড়ে না।

"আমার কিন্তু বেশ মনে পড়ছে, পাগলামীর ঝোঁকে তোমার ঠাকুরমা জবাব দিয়েছিলেন—"একটা দুঃখের পুঁটুলি, আর একটা লক্ষ্মীর দেওয়া ফুল; নাম ওদের কী আর হবে, দুঃখী, লক্ষ্মী!"

আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন তিনি। তেমন সময় লখু হাজির হলো সেখানে এক থোকা ফুল নিয়ে।

দুখু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—"ঠাকুরমা ঠিকই বলেছেন, দুঃখের পুঁটুলি আমি। ঠাকুরমার দুঃখ যদি ঘোচাতে পারতাম!" দুখুর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

দাদার চোখে জল দেখে লখু তাড়াতাড়ি ছুটে গেল তার কাছে, বললে—"কাঁদিস না দাদা, ফুল তো আমি তোর জন্যই এনেছি।" ফুলের গোছাটা দুখুর হাতে দিতে গেল। দুখু চোখের ইশারায় বললে—নাগ সাহেবকে ফুল দিতে। লখু ভারী অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো!

ঠিক তেমন সময় হঠাৎ দূর থেকে শোনা গেল, দুখুর ঠাকুরমা চেঁচাচ্ছে—"অরে দুখু! অরে লখু! কোইরে তরা বান্দর প্যাচা! যমে বুঝি অখনও লয় নাই তগো? তরা মরলে বাচি আমি।"

ঐ চিৎকার শুনে নাগমশাই চমকে উঠলেন। দুখুও রীতিমত ঘাবড়ে গেল। লখু কিন্তু একটুও ভয় পেলো না।

সেও জোর গলায় চেচিয়ে জবাব দিলে—"না রে না ঠাকুরমা—কেউ মরি নাই আমরা, বেঁচে আছি। যাচ্ছি।" ফুলের থোকাটা হাতে নিয়ে সে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়লো সেদিকে।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব দুখুকে বললেন—"যাও যাও, তুমিও ওর সঙ্গে যাও, আমি ডাক্তার নিয়ে এখুনি আসছি।"

পাঁচ

লখু-দুখুর ঠাকুরমা, উদ্বাস্তুপাড়ার সক্কলের 'পাগল-মা'। আবার ক্ষেপে উঠেছে। ক্ষেপামীর চিৎকারে ছেলেবুড়ো সবাই ছুটে এসেছে তামাসা দেখতে।

দুখু-লখুও পৌঁছে গেছে ভিড় ঠেলে। বুড়ি ঠাকুরমার কাণ্ড দেখে লজ্জা-ভয়ে তারা অবাক! বুড়ি ঘুরঘুর করে ঘুরছে। হঠাৎ জেগে-ওঠা পাগলামীর ঝোঁকে নিজেই নিজের চুলগুলো ছিঁড়ছে। আপন মনে বিড়বিড় করে বকছিল এলোমেলো কথা। দুখু ছুটে গিয়ে ডাক্তার আসার খবরটা দিতেই বুড়ি একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো। তিড়িং-বিড়িং করে লাফিয়ে উঠে, ঘুসি পাকিয়ে

চেঁচিয়ে উঠলো—"ডাক্তার! ডাক্তার! ডাক্তার আইয়া করবো আমার কোন্ কামডা শুনি? পারবো ডাক্তার আমাগো লগে বান্দর-নাচন নাচতে? আমরা নাচুম, আর হে খারাইয়া দেখবো? না, না! তা অইব না। তারেও নাচতে অইব, গাইতে অইব, আমাগো লগে।" বলেই বুড়ি অদ্ভুত ভঙ্গীতে নাচতে নাচতে গান জুড়ে দিলে—

বান্দর নাচে, নাচে বান্দর
কতই না তায় মজা।
পাঠার পিটে চইড়া বান্দর
খাইব পিঠা-গজা।
জোতা জামা পইরা বান্দর
যাইব শশুর বাড়ি
দেইখ্যা হাসে বেকুবগুলা,
ছাওয়াল-পাওয়াল ধাড়ি?

বুড়ির নাচের ভঙ্গি দেখে আর গান শুনে হেসে গড়িয়ে পড়লো চারপাশের সবাই। বিশেষ করে ছেলেমেয়ের দল। চোখের জল গড়িয়ে পড়লো দুখু-লখুর। দুঃখে, অপমানে ও লজ্জায়।

অসহায় দুখু-লখুও পাগলের মতো দু' পাশ থেকে ঠাকুরমাকে থামাবার জন্যে টানাটানি করছে। জলভরা কাতর চোখে বললে—"আঃ ঠাকুরমা করো কি? থামাও, থামাও তোমার পাগলামী!"

বুড়ি রয়েছে নিজের ঝোঁকে। কোনও কথাই কানে নিলে না। ঝাঁকুনি দিয়ে লাফিয়ে সরে গেল। হাঃ হাঃ হোঃ-হোঃ! বিকট একটা হাসি হেসে উঠলো। একদল ছেলেমেয়ের দিকে হাত দেখিয়ে বুড়ি বলে উঠলো—"আমার পাগলামী থামাইমু, তখন,

যখন এই সব বান্দরগুলা এক একটা চন্দর-সূর্য অইয়া যাইব। যখন মা-লক্ষ্মী তেনার লক্ষ্মী প্যাচাডারে কোলে তুইল্যা নিব? চুমা দিব, আদর করব? তখনই থাম্‌বো আমার পাগলামী!" বলেই বুড়ি মাটিতে গড়াগড়ি দিতে শুরু করলে।

হাসির রোলে বাতাস আবার ঠাট্টা করে উঠলো। সেই মুহূর্তে ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে নিয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব হাজির হলেন সেখানে। ওদের জীপ গাড়ির গর্জনের ধমকে ছেলেবুড়োর উল্লাস উপহাসের অত হাসি থতমতো খেয়ে থেমে গেল।

ভিড় ঠেলে ভেতর ঢুকে ওঁরা সবাইকে সরে যেতে বললেন ইশারায় ইঙ্গিতে। সুপারিণ্টেডেণ্ট নাগ সাহেবের কাছে দৌড়ে গিয়ে লখু নালিশ জানালে—"ঠাকুরমা দুষ্টমী আর ছেলেমানুষী করছে…"

লখুর কথা শেষ হলোনা। তাকে এক ধাক্কায় ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, বুড়ি ডাক্তারবাবুর পায়ে আছড়ে পড়লো। পা দুটো জড়িয়ে ধরে জলভরা চোখে আকুল প্রার্থনা জানালে—"ও ডাক্তার বাবা! তুমি ওসুদ দিয়া আমার দুখু-লখুরে একজোরা বান্দর বানাইয়া দ্যাও। আমি অগো নাচামু, খেলা দেখামু, আর বস্তা বস্তা টাকা মোহর আনুম বাসায়।" বলেই বুড়ি হাততালি দিয়ে হেসে উঠলো আবার। জিজ্ঞেস করলে—"আমার লাইগ্যা পারবা তুমি তা?" দুখু রাগে কটমট করে তাকিয়ে নিজের ঠোঁট দুটোকে কামড়াতে লাগলো।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আর ডাক্তারবাবু দুজনে বুড়িকে ধরে টেনে তুললেন। ডাক্তারবাবু বললেন—"নিশ্চয় নিশ্চয় পারবো, আপনি এখন শান্ত হয়ে ঘরে চলুন তো?"

ডাক্তারবাবুর ঐ কথা কানে যেতেই লখু রীতিমতো ঘাবড়ে গেল। ডাক্তারবাবুর হাতটা জড়িয়ে ধরে কাঁদো কাঁদো সুরে সে বললে—"না! না! ডাক্তারবাবু, আপনি আমায় বাঁদর বানাবেন না। আমি কিছুতেই বাঁদর হবো না।"

বুড়ি ডাক্তারবাবুর কাঁধে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে কান্নার সুরে তখনই আবার বলে উঠলো—"না! না! ডাক্তারবাবু, লখুরে আমার বান্দর বানাইয়ো না। অরে তুমি একটা পাখি, প্যাচা বানাইয়া দাও—উইর‍্যা যাইতে দ্যাও অরে মা লক্ষ্মীর কাছে।"

ডাক্তারবাবু বুড়িকে তাঁবুর ভেতর ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে বললেন—"বেশ তো! আপনি যা বলবেন, তাই হবে। ক্যাম্প-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লখুকে জড়িয়ে ধরে কানে কানে কি যেন বললেন, লখুর কান্না-মাখানো চোখে হাসি গড়িয়ে পড়লো। লখু চোখ মুছলো। দুখুকে টেনে নিয়ে ওরা সবাই ঢুকে গেল ওদের তাঁবু-ঘরটার মধ্যে।

আশপাশে যারা ভিড় করেছিল, তারাও হাসাহাসি আর মুখ-চাওয়া-চায়ি করে সরে গেল।

উদ্বাস্তু-বসতির চারধারে লখু-দুখুর বিপদের খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে। নিজেদের দুঃখ-দুর্দশার ঘা খেয়ে খেয়ে উদ্বাস্তুরা আধমরা। সমবেদনা জানাবার ইচ্ছা, মায়া-মমতা সব আছে ওদের। থাকা সত্ত্বেও ওরা নিজেদের অসহায় ভেবে চুপ করেই থেকে গেল।

উদ্বাস্তু-বসতির জীবনটাই অসাড়। সমস্যা, দুঃখ বিপদের তুহিন-তুফানে ওদের সমস্ত নরম গুণগুলো জমে ঠাণ্ডা কাঠ হয়ে থাকে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ও আর আর সরকারী কর্মচারীরা যারা সেখানে কাজ করেন, তাঁরাও আসেন সাহায্য করবার, দুঃখ

ঘোচাবার চঞ্চল উদ্দীপনা নিয়েই। কিন্তু সমস্যার তুলনায় সম্বল-শক্তি তাঁদেরও বড় কম হয়ে পড়ে। তাই জমাটবাঁধা বরফের মতো অসাড় জীবনগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে—তাঁরাও ক্রমশ অসাড় হয়ে যান, অসহায় হয়ে পড়েন।

নাগ সাহেবও অসাড় হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু লখুই যেন তাঁর মধ্যে নতুন সাড়া জাগিয়ে দিয়েছে। সেবা সমবেদনার নতুন শক্তি নতুন আগ্রহ তাঁর মধ্যে এমন করে জেগে উঠেছে যে, সেটা তিনি চেপে রাখতে পারলেন না। বাড়ি ফিরে, স্ত্রীকে, ছেলেমেয়ে সবাইকে বললেন সব কথা।

সমবেদনা, সেবার কথা, সবাই কি বোঝে? ওতে যে পরের বোঝা ঘাড়ে নিতে হয়, তাই বুঝেও কেউ কেউ অবুঝ সাজে। একজনের দুঃখের বোঝা হাল্‌কা করতে গিয়ে অনেক সময় আর পাঁচজনের সঙ্গে ভুল-বোঝাবুঝির বোঝাটাই ভারি হয়ে ওঠে।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের ঘরে সেই ভুল বোঝাবুঝির পালা শুরু হয় সকাল থেকেই। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-গিন্নীর মেজাজ যেন ঝাঁঝিয়ে উঠেছে। বিকেলবেলা ঘরে ঝাঁটা দিতে দিতে নিজের মনেই হঠাৎ তিনি গর্জে উঠলেন—"যা বলবেন উনি, তাই আমাকে করতে হবে? কেন? কিসের জন্যে? আমি কি ওঁর ক্যাম্প-কোম্পানীর উদ্বাস্তু?"

ঘরের এককোণে তাঁর দু'টি ছেলেমেয়ে তক্তপোশের ওপর কেউ খেলছিল, কেউ পড়ছিল। তাদের ভেতর থেকে রাণী বলে ছ' বছরের মেয়েটি মায়ের ঐ কথা শুনে মাথা ঘোরালো। ছেলেমানুষী

কৌতূহলে প্রশ্ন করে বসলো—"বাবা তোমায় কী করতে বলেছে গো মা ?"

"বলিসনে আর! কোন্ না কে লক্ষ্মীছাড়া হতভাগী উদ্বাস্তু মেয়ে লখুর মা চাই, আমাকেই তার মা হতে হবে। শোনো কথা, আমি যেন কারুর মা নই ?" জবাব দিলেন, নাগ গিন্নী খরখর করে ঘর ঝাঁট দিতে দিতেই।

সুপারিন্টেণ্ডেন্টের মেজো ছেলে ফস্ করে বলে বসলো— "ছ'জনতো আমরা আছিই মা, আর একজন না হয় বাড়লোই ?"

গিন্নী ঘাড় তুলে বললেন—"বড় আস্পর্ধা হয়েছে তোর, না ?"

বড় মেয়ে রত্না তাড়াতাড়ি তক্তপোশের ওপর তার বোনবার কুরুশকাঠি আর পশমের গুটিটা ফেলে দিয়ে মায়ের কাছে ছুটে গেল। আব্দারের সুরে বললে—"বাবার ওপর রাগ করো না মা, বাবা বলছিলেন—লখুদের নাকি ভারি বিপদ। ওর বুড়ি ঠাকুরমা একদম পাগল হয়ে গেছে, ওকে দেখবার কেউ নেই।"

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট-গিন্নী ঝাঁটাটা আছড়ে ফেলে ধমকে উঠলেন— "নেইতো নেই। বলি আদিখ্যেতাটা তোদের কেন ? আমাকে যদি অমনি করে এর-তার ছেলেমেয়ের ভার নিতে হয়, তাহ'লে তোদের দেখবে কে রে বাঁদর-গাধার দল ?"

রত্না ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। ছেলেমেয়েগুলো মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো! খপ্ করে পাশের একটা টুলের ওপরে বসে পড়ে গিন্নী বললেন আবার—"আজ যদি ঐ লখুকে আনতে দিই, কাল অমন আরও ক'টাকে নিয়ে আসবেন। আজকে উদ্বাস্তু বলছিস যাদের, কাল তারাই তোদের উদ্বাস্তু করে ছাড়বে। ওরা এক নম্বর নেমকহারাম। দেখছিস না, গবরমেণ্ট আর তোদের

বাবা ওদের জন্যে কিনা করছে, তার বদলে দিনরাত খালি গালাগালি আর নিন্দে !"

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার কলিংবেলটা ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠলো।

"নিশ্চয় বাবা এসেছে !" বলেই রানী তক্তপোশ থেকে এক লাফ মেরে নেমে পড়ে দরজার দিকে ছুটলো। অন্যান্য ছেলেমেয়ে-গুলোও ঘর থেকে ছুটে পালালো, মায়ের মেজাজ গতিক ভালো নেই দেখে।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গিন্নী দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কপাল চাপড়ে বলে উঠলেন—"হা আমার পোড়া কপাল ! আমার পেটের ছেলেমেয়ে-গুলোই ঘরের শত্তুর বিভীষণ ! ওরাই আমাকে উদ্বাস্ত করে তবে ছাড়বে।"

ঠাকুরমার পাগলামীর তাণ্ডব তিন দিন সমানে চলেছে। লখু-ডুখু মুখ বুজে সহ্য করেছে ঠাকুরমার কিল চড়, লাথি ঝাঁটা। সহ্য না করে উপায় নেই। ঠাকুরমা যখন ভালো থাকেন, তখন তিনিও তো লখু-ডুখুর হাজারো আব্দার লাখো অত্যাচার সহ্য করেন।

তিন দিন পরে, কাল রাত থেকে ঠাকুরমার লাফঝাঁপ চিৎকারটা কিছু কম পড়েছে—তবে চোখে-পাতায় করেননি ক'টা রাতই। ডাক্তারবাবু ঘুমের জন্যে একশিশি বড়ি দিয়েছিলেন।

রোজ ছ'ছটা করে বড়ি খাইয়েও এক ফোঁটা ঘুম আনতে পারেননি তিনি ঠাকুরমার চোখে। দুখু লখুরও ভালো করে ঘুম হয়নি ক'রাত ক'দিন। ভাবনা ভয়ের কালো ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে তাদের চোখে মুখে।

দুখুরই ভাবনাটা বেশী। ডাক্তারবাবু আর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নাগ সাহেব বলে গেছেন, না-খাওয়া না-ঘুমোনোর যেসব লক্ষণ দেখা দিয়েছে, তাতে শহরের বড় হাসপাতালে পাঠাতেই হবে বুড়িকে। ঠাকুরমার মনের রোগটার ভালোমতো চিকিৎসার দরকার।

লখু ততটা ঘাবড়ায়নি। ভূতের ভয়ে কিংবা মায়ের কথা ভেবে ভেবে সেও তো কতদিন সারারাত ঘুমোতে পারে না! তার জন্যে তাকে তো হাসপাতালে পাঠাতে হয় না! ঠাকুরমাই বরং ঘুম-পাড়ানি গান গেয়ে, মাথা চাপড়ে চাপড়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেন।

সেই ফন্দিটাই আজ তার মাথায় খেলছে। লখুও ঠাকুরমার পথ ধরে ঠাকুরমাকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করবে। সারারাত চেঁচামেচি করে বুড়ি ক্লান্ত। শুয়ে পড়েছে মাটির ওপর উপুড় হয়ে। লখু দেখলে—এই সুযোগ।

ঠাকুরমার মাথাটা চাপড়ে চাপড়ে ঠাকুরমার গাওয়া ঘুমপাড়ানী গানটাই গাইছে লখু। তার এ ব্যবস্থাটা খানিকটা কাজে লেগেছে বলেই মনে হচ্ছে। ঘুমপাড়ানী গান শুনতে শুনতে বুড়ি বক্‌বকানি থামিয়ে ক্রমশঃ যেন চুপ করে আসছে। জড়ানো কথার বিড়বিড়িনিতেই বোঝা যাচ্ছে ঠাকুরমার চোখে ঘুম আসছে জড়িয়ে। পাগলামীর উত্তাপটা আসছে জুড়িয়ে।

দুখুর কানেও ভেসে আসছিল লখুর ঐ ঘুমপাড়ানি গানের
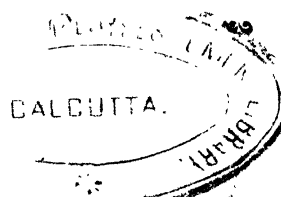
সুর, ঠাকুরমার বকবকানি। তাঁবুর বাইরে এককোণে, দুখু দু'খানা ইঁটের উনুনে পোড়া কালো হাঁড়িটাতে ভাত চড়িয়েছে। কুড়িয়ে-আনা কাঠের কুচো আর ডালপালার জ্বাল ঠেলছে। ধোঁয়ার জ্বালা-মাখানো ঝাপসা চোখে লখুর মিষ্টি ঘুমপাড়ানি গানে সে কান পেতে দিয়েছে। তার চোখের কোল-ভাসানো জলের ঢেউগুলো নেচে নেচে উঠছে—আশা আনন্দের সুরের তালে তালে। ভাত ফুটছে ফ্যানের পাহাড় ফুলিয়ে, ফেলে দিয়ে।

লখুর গানের সুর তাল ক্রমশঃ খাদে নেমে আসতে আসতে হঠাৎ থেমে গেল। উনুনে একটা শুকনো ডাল গুঁজে দিতে দিতে দুখু আপন মনে বলে উঠলো—"কী যন্ত্রণা! ঠাকুরমা তিন দিন ঘুমোয়নি! আজ যদি ঘুমোয় বেশ কিছুটা, তবেই রক্ষে। তা না হলে হাসপাতালে ওরা নিয়ে যাবেই ঠাকুরমাকে······"

দুখুর কথা শেষ হতে না-হতেই—লখু তাঁবুর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। অহঙ্কারের ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো—"হাসপাতালে নিয়ে যাবে কোন্ দরকারে? আমি ঠাকুরমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি।" একটু থেমে বলে উঠলো—"ঘুমের বড়িগুলো চুলোয় ফেলে দিই—লাগবে না আর এগুলো।" বলেই লখু হাত তুললো ঘুমের ওষুধের শিশিটা উনুনের ভেতরে ফেলে দেবার জন্যে।

লখুর হাত থেকে ঝট করে ওষুধের শিশিটা কেড়ে নিয়ে দুখু বললে—"আঃ করিস কী! তুই আর ঠাকুরমা চলে গেলে আমার তো ঘুম হবে না! তখন ওগুলো কাজে লাগবে।"

ঠিক সেই মুহূর্তে ঠাকুরমাবুড়ি বেরিয়ে এলো তাঁবুর ভেতর থেকে। শাড়ির আঁচলটা বগলে পুরে। আলুথালু বেশে। উদাস চোখে বললে বুড়ি—"লক্ষ্মীর প্যাঁচা লখু আমার উইরা যাইব।

দুখু বান্দর নাচবো। আমি বাজামু ডুগডুগি! হাঃ হাঃ হাঃ।"

দুখু লখু চমকে ফিরে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে দূরে শোনা গেল মটরগাড়ির বিদঘুটে ভেঁপু। পিঁপ-পিঁপ-পিঁপ!

"হাসপাতালের গাড়িরে লখু! অ্যাম্বুল্যান্স।" বললে দুখু চমকে উঠে, ঘুরে দাঁড়িয়ে।

খিলখিল করে হেসে, আপন মনেই বুড়ি বিড়বিড় করে বললে —"মনে পড়ছে। মনে পড়ছে—দিনটা আমার ঠিকই মনে পড়ছে।" ছুটে চলে গেল বুড়ি তাঁবুর ভেতরে।

মানুষ টেনে আনার, ভিড় জড়ো করার অদ্ভুত শক্তি হাসপাতালের ঐ সাদা গাড়িগুলোর। উদ্বাস্তু-বসতির ছেলেবুড়ো সবাই ছুটে এসেছে গাড়িটার পিছু পিছু। জড়ো হয়েছে দুখুদের তাঁবুটার সামনে। অ্যাম্বুল্যান্সটার চারপাশে। সকলের চোখ নাচছে মজার আমেজে। সবাই দেখছে—দুখু-লখুর ঠাকুরমাবুড়িকে জোর জবরদস্তি গাড়িতে তোলা হচ্ছে। দুখুর চোখে জল টলমল করছে।

লখুর চোখে কিন্তু হাসির ঝিকিমিকি। ঠাকুরমাকে হাসপাতালে পাঠানোর তার অতো যে আপত্তি—সব কোথায় যেন ভেসে গেছে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের হাত ধরে আবেগের উত্তেজনায় জিজ্ঞাসা করলে—"আমিও যাবো সঙ্গে? ড্রাইভারের পাশে বসবো কিন্তু?"

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব হেসে জবাব দিলেন—"নিশ্চয়ই!"

লখু ছুটে গিয়ে, ভিড় ঠেলে, একলাফে উঠে পড়লো গাড়ির ড্রাইভারের পাশে।

ঠাকুরমাকে গাড়ির ভেতরে পুরে দরজাটা বন্ধ করে দিতেই দুখু

আর নিজেকে সামলাতে পারল না। ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এলো সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কাছে—"লখু। লখু কই ?"

"ওকে আমি নিয়ে যাচ্ছি আমার বাড়িতে। তুমিও চল না আমার সঙ্গে !" বললেন নাগ সাহেব দুখুকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

দুখু তাড়াতাড়ি চোখ মুখে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—"না স্যার ! আমার ব্যবস্থা আমি করে নেবো। ঠাকুরমা হাসপাতাল থেকে ফিরে-না-আসা পর্যন্ত লখুকে সামলানোই মুস্কিল। ওর যদি একটা ব্যবস্থা করেন।"

নাগ সাহেব বললেন—"সে ব্যবস্থা করতেই হবে, তুমি যে হীরের টুকরো ছেলে। মন খারাপ করোনা বাবা, ভেবোনা তুমি ?"

দুখু জলভরা চোখে ঘাড় নেড়ে জানালে—সে ভাববে না, মন খারাপ করবে না।

"আচ্ছা তাহ'লে চলি। পরে এসে সব খবর দেবো, কেমন ?" বলেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব গাড়িতে চড়ে বসলেন লখুকে কোলে নিয়ে।

বাতাস কাঁপিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে এ্যামবুল্যান্স নড়ে উঠলো। ধুলো উড়িয়ে ছুটলো জোরে। লখু জানলার ভেতর থেকে হাত নাড়িয়ে চেঁচিয়ে বললে—"দাদাভাই ! আমি এক্ষুনি ফিরে আসবো। ভাবিস না ! কাঁদিস না !"

ভিড়ও দৌড়ালো অ্যামবুল্যান্সটার পিছু পিছু। দুখু দৌড়ল না—শুধু চোখ দুটো তার দৌড়ল ওদের সঙ্গে। পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে সেও বিদায় জানালে ওদের। প্রমাণ দিলে শক্ত মন, শক্ত সাহসের।

গাড়িটা চোখের আড়ালে—একেবারে যখন মিলিয়ে গেল,

তখন সে দাঁড়াতে পারলে না। টলতে টলতে ছুটে এসে হুমড়ি খেয়ে শুয়ে পড়লো ঘরের মেঝেতে। ঠাকুরমার ছেঁড়া ময়লা পুঁটলি পাকানো মটকার শাড়িটা টেনে নিয়ে তার মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলে।

বাইরে ইঁটের উনুনে চাপানো ভাতের হাঁড়িটা থেকে ফেন গড়িয়ে পড়ে—আগুন যেটুকু ছিল তাও নিভিয়ে দিলে। দুখুর মনের দুঃখের আঙরাগুলো যেন জোরে—আরো জোরে জ্বলে উঠলো।

সাত

সাতদিন কেটে গেছে। শহরের হাসপাতালেই রয়েছে ঠাকুরমা। পাগলামীটাও কমেছে অনেকখানি। নাগ সাহেব লখুকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গেছেন নিজের বাড়িতেই। এসব খবর টের পেয়েছে দুখু। নাগ সাহেবের মুখ থেকেই। আসল খবর, নাগগিন্নী যে কতখানি চটে আছেন মনে মনে, সেটা লখু দুখু কেউই টের পায়নি। ছেলেমেয়ে কর্তা সবাই লখুকে নিয়ে আদিখ্যেতা করছে দেখে, মনের ঝাল মনেই চেপে রেখেছেন নাগগিন্নী।

সেদিন রাত্রে খাবার ঘরে ছেলেমেয়েদের খেতে দেওয়ার বন্দোবস্ত করছিলেন নাগগিন্নী। টেবিলের ওপর সাজানো বিলাতি কাচের ডিসে দুধের মতো সাদা ভাত, তরকারি। তেমন সময় ঘরে ঢুকলো রাঁধুনী ঠাকুর। একটা কলাইকরা থালায় ভাত তরকারি সাজিয়ে নিয়ে। ঠাকুর ঐ থালাটাও টেবিলের

ওপর রাখতে যাচ্ছে দেখে, নাগ-গিন্নী চেঁচিয়ে উঠলেন—"ওখানে নয় ওখানে নয়! মেঝেতেই রাখো। এখন থেকে এ-বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে লখুকে আর টেবিলে খেতে দেবে না, বুঝলে ?"

লম্বা চওড়া পশ্চিমা ব্রাহ্মণ পাঁড়েজী, রাঁধুনী বামুনের কাজ করলেও মনটা তার ভারি নরম। তাই বেচারা হকচকিয়ে গেল। বোকা বোকা চোখ করে জিজ্ঞেস করলে—"মাঈজী, রোজদিন তো টেবিলে খাইতে দিলেন, আজ নীচে খাইতে দিলে বেচারার দুখ লাগবে! হাঁপনারেই যে সে মা জানছে মাঈজী!"

"না না, অত বোকা মেয়ে নয় সে।" বললেন নাগগিন্নী চটে উঠে। "এই মাত্তর আমি নিজের কানে শুনে এলুম, রানীকে বলছিল—আমার মা, লক্ষ্মী ঠাকরুণের মতো দেখতে।"

পাঁড়েজীর মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে পড়লো—"কিন্তু হাঁপনারেই তো খোঁকিটা মা ডাকছে মাঈজী!"

"ওসব ওর চালাকী, আমার কাছ থেকে আদর নেওয়ার ফন্দি! কথা কয়োনা, যা বলছি করো, থালাটা মেঝেতে রেখে ছেলেমেয়ে-গুলোকে ডেকে দাও।"

রাঁধুনী বামুনের কথা থাকবে না আজ আর। বুঝতে পেরেই পাঁড়েজী ভাতের থালা মেঝেতে নামিয়ে দিলে। জলভরা চোখে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

পাশের ঘরে লখু অঙ্গভঙ্গি করে ছড়া বলছিল—আর নাগ-সাহেবের ছেলেমেয়েগুলো হো হো করে হাসিহল্লা করছিল।

পাঁড়েজী ডাকতে আসতেই ওরা একসঙ্গে বললে—"আমরা এখন নেহি খায়েগা, বাবা এলে একসঙ্গে খায়েগা।"

পাঁড়েজী খাবার ঘরে নাগগিন্নীকে সেই খবরটাই দিলে। মুখ

কাঁচুমাচু করে বললে—"মাঈজী, ও-লোক বললে—বাবুজী আসবে তখুন খাবে।"

নাগগিন্নী রাগের চোটে লাফিয়ে উঠতেই, হাত লেগে একটা কাচের গেলাস ঠিকরে পড়্‌লো। ঝনঝন করে ভেঙে গেল। চোখ পাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি—"হতভাগারা ভেবেছে কি! আমি এখনও মরিনি! কদিনেই লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটা সক্কলের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে গা!"

বেরিয়ে গেলেন তিনি। অপমান, অভিমানে ছট্‌ফটিয়ে।

দুখুদের তাঁবুর সামনে জোড়া ইঁটের উনুনটাতে ফট্ ফট্ করে জ্বলছে কুড়িয়ে-আনা ডালপালাগুলো। পোড়া হাঁড়িতে ভাত ফুটছে। ভাঙা লণ্ঠনটা জ্বলছে টিম্ টিম্ করে। অন্ধকারে চারপাশে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে, জোনাকী জ্বলছে। দুখু জলভরা চোখে শুনছিল, নাগসাহেবের মুখ থেকে ঠাকুরমার খবর, লখুর খবর। ক'দিন তিনি আসার সময় পাননি, আজ তাই ছুটে এসেছেন সন্ধ্যা বেলাতেই।

দুখু বড় বেশী চুপ করে রয়েছে দেখে নাগসাহেব দুখুর কাঁধে হাত রাখলেন। বললেন—"জানো হে! এই ক'দিনেই লখু আমার বাড়ির সক্কলের মন কেড়ে নিয়েছে। নতুন সঙ্গী সাথী আর খেলনা পুতুল পেয়ে সে এমন মেতে আছে যে মন খারাপ করবার সময়ই নেই তার।"

দুখু জলভরা চোখ তুলে ঘাড় ঘুরিয়ে বললে—"শুনে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে! আপনার দয়াতেই হয়েছে স্যার! সত্যি আপনার ছেলেমেয়েরা বড্ড ভালো।"

"বেশ তো! তুমিও তাহ'লে চল না? থাকবে ওদের সঙ্গে, একসঙ্গে?" বললেন নাগসাহেব।

দুখু ঘাড় নিচু করে বললে—"আমি কী করে ঘর ছেড়ে যাবো স্যার! আমাকে সুতো কাটতে হয় যে সারাদিনই!"

"সারাদিন তুমি সুতো কাটো? কেন অতো কষ্ট করো বাবা?" জিজ্ঞেস করলেন নাগসাহেব দুখুর মাথায় হাত বুলিয়ে।

"পয়সা রোজগারের জন্যে। নিজের রোজগারে বাঁচতে চাই আমি। ভিক্ষে করে দেনা করে আমি বাঁচতে চাই না।" বললে দুখু, তার মনের আবেগটা চাপতে না পেরে।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নাগসাহেব বাঁ-হাতটা বাড়িয়ে দুখুকে বুকে টেনে নিলেন, বললেন—"ভগবান তোমার ভালো করুন বাবা! তোমার মতো সমস্ত উদ্বাস্তু ছেলেমেয়েদের মনে ঐ সঙ্কল্পই জেগে উঠুক, এটাই আমার প্রার্থনা।" বলতে বলতে ডানহাতে প্যাণ্টের পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে দুখুর বুক পকেটে সেটা গুঁজে দিলেন।

দুখু শিউরে উঠে জিজ্ঞেস করলে—"কিসের জন্যে এ-টাকা!"

নাগসাহেব ব্যস্ত হয়ে বললেন—"পাঁচ টাকার সুতো দেবে আমাকে তুমি! সুতোর দামটা আগাম দিয়ে রাখলুম।"

দুখুর হাসি আর চোখের জল একসঙ্গে মিশে গেল। আনন্দে কৃতজ্ঞতায় দুখু উচ্ছল হয়ে বলে উঠ্‌লো—"আপনি একটু দাঁড়ান স্যার! পাঁচ টাকার সুতো আমার কাটা হয়ে গেছে। এক্ষুনি এনে দিচ্ছি!" দুখু সুতো আনতে ঢুকল তাঁবুর ভেতরে, লণ্ঠনটা নিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নাগসাহেবও সরে পড়লেন। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে।

সুতোর ফেটিগুলো গুছিয়ে আনতে দুখুর কিছুটা সময় লাগলো। সুতো নিয়ে দুখু যখন বাইরে এলো, দেখলে কেউ কোত্থাও নেই। নিজের মনেই বলে উঠলো—"নাগসাহেব আবার কোন্ তাঁবুতে গেলেন!" চারধার চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে লণ্ঠনটা সে নামিয়ে রাখলে। বিড় বিড় করে বললে—"পাঁচটা টাকার আমার বড্ড দরকার ছিল। সুতোটা বিক্রির ব্যবস্থা ভগবানই করে দিয়েছেন! ঠাকুরমা ঠিকই বলে, ভগবানই সব ব্যবস্থা করে দেন।" হঠাৎ দুখুর খেয়াল হলো সুতোটা নাগসাহেবকে না-দেওয়া পর্যন্ত টাকাটা তো তার নেওয়া ঠিক হবে না। নাগসাহেবকে খুঁজে বার করার জন্যে তখনই সে অন্ধকারে দৌড়লো, চেঁচাতে লাগলো—"স্যার! আপনার সুতোটা!"

নাগসাহেবের বাড়িতে খাবার ঘরের টেবিলে খেতে বসেছে নাগসাহেবের ছেলেমেয়েগুলো। কিন্তু মন তাদের নেই যেন খাওয়াতে। চোখে মুখে সকলেরই বিরক্তি আর রাগের ছায়া। মুখ গোঁজ করে ওরা ভাত নাড়াচাড়া করছে, চিবুচ্ছে।

লখু কিন্তু মেঝেতে বসে দিব্যি সপাসপ্ করে খাচ্ছে হাসিমুখে। খাওয়া প্রায় শেষ করে এনে লখু দু' ঢোক জল গিলে বললে—"এই ক'দিনের মধ্যে আজই আমি চটপট পেট ভরে খেয়েছি। তুমি ওদেরও মেঝেতে খেতে দাও না কেন মা? মেঝেতে বসে খেতে ভারি মজা!"

নাগগিন্নী আড়চোখে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন—"হুঁ! আজ থেকে মেঝেতেই মাদুর পেতেই শুস তাহ'লে, কেমন? মেঝেতে শুতেও খুব আরাম, জানিস?"

পাঁড়েজী সেই সময় ঘরে ঢুকলো একটা থালায় ছেলেদের ছ'টা

দুধের বাটি সাজিয়ে নিয়ে। গিন্নীর কথাটা কানে যেতেই পাঁড়েজী থমকে থেমে গেল। তাকালো লখুর দিকে আড়চোখে। লখু বলে উঠলো—"ঠিক বলেছ মা! রানীর সঙ্গে ঐ নরম বিছানাটাতে শুয়ে কদিন আমার একটুও ঘুম হয়নি, বিছানাটা বড্ড নরম।"

পাঁড়েজী চোখ পাকালো। কি যেন যাচ্ছিল সে বলতে। লখু পাঁড়েজীকে চোখের ইশারায় থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলো—"তুমি যদি রাগ না করো মা তাহ'লে আমি বারান্দায় পাঁড়েজীর মাদুর-টাতেই শোবো। পাঁড়েজী একটা দুষ্টু রানীর গল্প শুরু করেছে। শেষ হয়নি! শুনবো সেটা খুব মজা করে।"

লখুর কথায় পাঁড়েজী খুব বিব্রত হয়ে পড়লো। লজ্জা ভয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সে প্রতিবাদ জানিয়ে বললে—"না! না লখ্যি! হামার সঙ্গে কি করে ঘুমাবে তুমি। হামার চাটাইতে ছারপোকার কলোনী আছে।"

রানী ও অন্যান্য ছেলেমেয়েরাও প্রতিবাদের সুরে বললে—"না! লখু আমাদের কাছেই শোবে। ওর ঠাকুরমার কাছে শোনা গল্প বলবে যে!"

ছেলেমেয়েদের কথা শুনে নাগগিন্নী একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। হুকুমের সুরে চিৎকার করে বললেন—"আমি যা বলছি তাই করতে হবে। লখু আজ থেকে পাঁড়েজীর কাছেই শোবে। বেশী যদি জ্বালাও তোমরা, তাহ'লে সবকটাকে একসঙ্গে বাইরে পুঁটলি বেঁধে বার করে দেবো!"

তাঁর ঐ চিৎকারে নাগসাহেবের বাড়ির খাবার ঘরটা স্তব্ধ হয়ে গেল! মুখ শুকিয়ে গেল সক্কলের। লখু কিন্তু মুখ নিচু করে মুচকি হাসি হাসলে।

আট

বাতি জ্বালাবার তেল জোটে না। উদ্বাস্তু-বসতির বাসিন্দারা তাই সন্ধে রাতেই রাঁধাবাড়া সারে। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ে, আলো নিভিয়ে তাড়াতাড়ি।

হুড়োহুড়ি, কাড়াকাড়ি, চেঁচামেচি, মারামারি যা কিছু ওদের—দিনের আলোতেই। পাখিদের মতোই ওদের জীবন। সারাটা দিন পেটের দায়ে খানা-দানা জোটানোর ছুটোপাটি, ছুটোছুটি। সন্ধ্যার পর সবাই চুপচাপ, সব নিস্তব্ধ। ভাবনা উত্তেজনার ডানা গুটিয়ে নিজের নিজের কাচ্চাবাচ্চা আগলায়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও ওরা জেগে থাকে। কেউ কেউ আবার জেগে জেগেই ঘুমোয়।

রাত আটটার পর বাতি জ্বালাবার হুকুম নেই কারুর ঘরে। রাতের পয়লা পহরেই নিশুতরাতের নিঝুম নূপুর বেজে ওঠে ঝুম ঝুম করে—ঝিঁ ঝিঁ পোকাদের ডানায় পাখায়। সারা উদ্বাস্তু-বসতিটার চারধারে। সাপ শেয়ালরা বেরিয়ে পড়ে শিকারের খোঁজে।

সেদিন রাতেও চারধার নিঝুম নিস্তব্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কলরব কোলাহল বলতে কিছু নেই। শোনা যাচ্ছে একটানা ঝি ঝি পোকার ডাক। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। দুখুর চোখে ঘুম নেই।

দুখু ছেড়া চাটাইয়ের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। ময়লা তেলচিটে বালিশটার ওপর মাথা রেখে। আকাশের চাঁদের আলো দুখুদের তাঁবুর দরজা ডিঙিয়েছে। ছড়িয়ে পড়েছে ওর

মুখে মাথায়। জেগে জেগেই সে স্বপ্ন দেখছিল আনমনা হয়ে। হাই তুলে পাশ ফিরে শুলো চোখ বুজে। হঠাৎ দূর থেকে ভেসে এলো ক্যাম্প-আপিসের ঘণ্টা। ঢং ঢং করে বাজলো বারোটা।

ঘণ্টা থামতেই দুখু শুনতে পেলে ঠাকুরমা যেন বলছে—"জাইগা জাইগা ঘুমাইলে কষ্টটা টের পাবি ক্যামনে? ভিক্ষা করতে লজ্জা যখন তর। শহরে যাইয়া টাকা কামাইয়া আন্‌না ক্যান্?"

দুখু বিহ্বল চোখ মেলে আবার ঘুরে শুলো চিৎ হয়ে। হুশ করে বেরিয়ে এলো বুকের খাঁচা থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস। দুখুর দীর্ঘশ্বাসে চারপাশের বাতাস যেন কেঁপে উঠলো, কেঁপে উঠলো চাপা একটা আর্তনাদে।

হক্‌চকিয়ে ভয় পেয়ে, দুখু উঠে বসলো ধড়মড়িয়ে। চোখ রগড়িয়ে চেয়ে দেখলো চারদিক। কানে এলো দূর থেকে ভেসে আসা রেল গাড়ির বাঁশি। ঝিক্ ঝিক্ ঝক ঝক আওয়াজ। উঠে দাঁড়ালো দুখু। পকেট থেকে বার করলে নাগসাহেবের দিয়ে যাওয়া পাঁচ টাকার সেই নোটটা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলে সেটা। তারপর কিনা কি ভেবে, নোটটা পকেটে গুঁজে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল হন্‌হন্ করে।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নাগ সাহেবের বাড়ির আলো-বাতিও নিভে গেছে অনেকক্ষণ। ঘুমিয়ে পড়েছে বাড়ির লোকজন। ঘুমোয়নি লখু। ঘুমোতে দেয়নি সে পাঁড়েজীকেও।

নাগ সাহেবের বাড়ির বাইরে বারান্দায়। লখু উপুড় হয়ে শুয়ে আছে পাঁড়েজীর মাদুরে। ভাঁজকরা কনুয়ের চাড়া দেওয়া হাত দুটোর চেটোতে চিবুক রেখে। ঠাকুর পাঁড়েজী খৈনী টিপতে

টিপতে বলছিল সেই রাক্ষুসী রানীর গল্পটাই। আকাশের চাঁদের আলোয় লখুর চাঁদমুখে চোখ ছুটো জ্বলছিল জ্বল জ্বল করে। ঘুমের ছায়া নেই সে চোখে। কৌতূহলের ঝিকিমিকি।

হঠাৎ লখু জিজ্ঞেস করলে—"ছোট্ট রাজকন্যাটার ওপর রাক্ষুসী-রানীর অত্যেচার দেখে রাজবাড়ির রাঁধুনী বামুনটার অত কষ্টই হচ্ছিল যদি, তবে সে কেন কোথাও পালিয়ে গেল না রাজকন্যাটাকে নিয়ে ?"

"পালায়তে সে চায়লো। রাজার বেটি বুঝলে না যে!" জবাব দিলে পাঁড়েজী কান্নাচাপা গলায়।

"ধ্যেৎ! রাজকন্যাটা একদম বোকা। অমন বোকামী কেউ করে!" বলতে বলতে বিরক্ত হয়ে উঠে বসলো লখু।

পাঁড়েজী এদিক সেদিক দেখে নিল চোখ ঘুরিয়ে।—"তুমি ভি বোকা হইয়ে যাবে। হামি যদি তোমাকে রাজার বেটি বানায়ে দেই।" বললে ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে।

লখু চোখ ঘুরিয়ে বললে—"কক্ষনও না। আমায় রাজকন্যা বানিয়ে দিলে, তোমাকেও রাজবাড়ির রাঁধুনী হতে হবে। আমি তোমাকে হুকুম দেবো—'পালাও এখান থেকে আমাকে নিয়ে।' খুব একটা মজার খেলা হবে, না ?"

পাঁড়েজীর চোখ দুটো খুশিতে ঝিকমিক করে উঠলো। হেসে বললে—"বহুৎ মজার খেলা হোবে। খেলবে তুমি? হামিতো রেডি আছে। তুমি রাজার বেটি হইয়া যাও, হুকুম দাও, হামি তামিল করবে।"

লখু উঠে দাঁড়ালো খিলখিল করে হেসে। ঝট করে পাঁড়েজীর কাঁধ থেকে রঙচঙে গামছাটা টেনে নিয়ে সেটাকে

ওড়নার মতো করে মুখে ঢাকা দিয়ে গম্ভীরভাবে বললে—"আমি রাজকন্যে বকুলমালা। হুকুম দিচ্ছি, এখুনি পালাও। আমাকে নিয়ে চলো একেবারে সোজা পরীর দেশে।"

পাঁড়েজীও চাপাগলায় বললে—"জরুর যাবে পরীর দেশে! সেখানে যাইলে সব দুখ খতম হইবে। তুমি আমার কান্ধে চড়ো তাহ'লে।"

লখু ছুটে গিয়ে পাঁড়েজীর গলা জড়িয়ে কাঁধে চড়ে বসলো। পাঁড়েজী নাগরা জুতো আর লাঠিটা হাতে তুলে নিলে বারান্দার এক কোণ থেকে। পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলো, সাবধানে বাগানের ফটকটা খুলে।

ফটকের বাইরে পা দিয়ে হন্‌হনিয়ে ছুটলো জোরে। মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

ঠাকুরমা শহরের হাসপাতালে চলে যাওয়ার পর থেকেই, দুখুর মাথায় জেগেছিল শহরে যাওয়ার ফন্দি। হাতে টাকাপয়সা ছিল না বলেই মতলবটা হাঁসিল করতে পারেনি। কিন্তু দূরের থেকে ভেসে-আসা রেলগাড়ির বাঁশি আর হঠাৎ-মনে-পড়ে-যাওয়া ঠাকুরমার কথাগুলোই তার মনটাকে নাড়া দিয়েছে। নাগমশায়ের দিয়ে-যাওয়া টাকা পাঁচটাও তার ভরসা বাড়িয়েছে। ছুটতে ছুটতে সে হাজির হয়েছে ইস্টিশানে। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে। কাঁটা তারের বেড়া ডিঙিয়ে।

দুখু ইস্টিশানে পৌঁছবার আধ ঘণ্টা পরে। ধিকি ধিকি ঝিকি ঝিকি মল বাজিয়ে শহরে যাওয়ার ট্রেনটাও ইস্টিশানে ঢুকলো।

আগের থেকেই টিকিট কিনে সে তৈরি ছিল। ট্রেন থামতেই,

সাত তাড়াতাড়ি সে ছুটে গিয়ে উঠে বসলো গাড়ির পিছন দিকের একটা কামরাতে।

মতলব তার, গার্ডসাহেব কি ক'রে লাল আলোটাকে সবুজ করে দেয়। বাঁশি বাজিয়ে গাড়ি ছাড়তে বলে কী করে, সেটাই দেখা। অবাক হয়ে দেখলে দুখু, গার্ড সাহেব লাল আলোটাকে সবুজ করে দিলে। সবুজ আলোটা নাড়িয়ে বাঁশি বাজাতেই ট্রেনটা নড়ে উঠলো। চলতে শুরু করলো। দুখু জানতো লাল আলো বিপদের নিশানা। সবুজ আলো চলার ইশারা। গার্ড সাহেবের সবুজ নিশানায় দুখুরও বিপদের আশঙ্কাটা যেন সরে গেল। মন তারও চলতে শুরু করলে আশার পথে।

গাড়ি যখন আস্তে আস্তে চলতে শুরু করেছে, তেমন সময়, লখুকে কাঁধে নিয়ে ছুটতে ছুটতে এলো পাঁড়েজী। লাফিয়ে উঠে পড়লো সে সামনের দিকের আর একটা কামরাতে। পাঁড়েজী ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনটা ক্রমশ বেগ বাড়ালো। অন্ধকারের পর্দায় গাছপালার ছায়াছবিগুলোকে পেছনে ফেলে, ট্রেন ছুটে চললো শহরের দিকে।

গাড়িতে চেপে বসে দুখু নিশ্চিন্ত হয়েছে। আশা-আনন্দে মনটা যেন ক্রমশ ভরে উঠছে। ভাবছে শহরে গিয়ে সে বাসে ট্রামে চড়ে সব আগে চলে যাবে শহরের হাসপাতালে। ঠাকুরমা কেমন আছে, সে খবরটা জেনে নিয়ে তারপর বেরুবে রোজগারের ফিকিরে।

এমনি নানা কথা ভাবতে ভাবতে, অন্ধকারে বন, গাছপালার ছবি দেখতে দেখতেই দুখু ঘুমিয়ে পড়লো। ট্রেনের দোলানি খেয়ে।

লখুকে নিয়ে পাঁড়েজী যে কামরাটায় উঠেছিল, সেটা বেশ খালিই ছিল। যাও বা দু-চারজন যাত্রী ছিল, তারাও ঘুমোচ্ছিল মুখে চাদর-মুড়ি দিয়ে, নাক ডাকিয়ে।

রেলগাড়িতে চড়ে লখুর ভারি ফুর্তি। পাঁড়েজীর কোলে মাথা রেখে সে বলছিল—পরীর দেশে গিয়ে সে কি কি করবে, কি কি খাবে। দাদাভায়ের জন্যে চেয়ে নেবে একটা মস্ত পক্ষীরাজ ঘোড়া। ঠাকুরমার জন্যে চেয়ে আনবে পাগলামী-সারানোর টোটকা ওষুধ ইত্যাদি। পাঁড়েজী ওর কথা শুনে ঘাড় নাড়ছিল আর ভাবছিল অনেক কথা।

কথা বলতে বলতেই লখুর চোখ বুজে এলো। পাঁড়েজী কিন্তু ঘুমোতে পারলে না। লখুকে ঘুম পাড়িয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইলো জেগে। লখুর মুখখানাতেই সে দেখছে তার চেনা-চেনা আদরের সোনা মুখখানা। ভয় ভাবনার সঙ্গে আনন্দের দোলা লেগে তার মনটাও দুলে দুলে এগিয়ে চললো অজানা আশার দেশে।

নয়

ভোর হয় হয়। বাইরে রাতের অন্ধকার তখনও ভালো করে কাটেনি। তেমন সময় ট্রেনটা ঢুকলো শহরের ইস্টিশানে। জোরে জোরে হুঁশিয়ারীর বাঁশি বাজিয়ে। ঝনাক ঝন্ ঝনাক ঝন্ শব্দ করে। সারা গাড়িটায় ঝাঁকুনি লাগিয়ে।

লখুর ঘুমটা পাতলা হয়েই এসেছিল। ঝাঁকুনি খেয়ে, ইঞ্জিনের কানফাটানো বাঁশির আওয়াজে সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো। ট্রেনের

কামরার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলে ভোরের আলোয় ঝকমকে শহরের ইস্টিশানটা। তার ভেতরে গাড়িটা ঢুকছে অজগরের মতো এঁকে বেঁকে, ফোঁস ফোঁস শব্দ করে। হকচকিয়ে উঠে পাঁড়েজীকে ধাক্কা মেরে চাপা গলায় বললে সে—"ঠাকুরজী! ঠাকুরজী! পরীর দেশ এসে গেছে!"

সারারাত জেগে বসে থেকে ভোরবেলাতে পাঁড়েজী ঘুমিয়ে পড়েছিল অঘোরে। লখুর ধাক্কা খেয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো। রাতজাগা লালচোখ দুটো রগড়িয়ে দেখলে, গাড়ির আর সব যাত্রীরা তখনও ঘুমোচ্ছে। লখুর কথার কোনও জবাব না দিয়ে, ঝট করে লাঠিপুঁটলি সামলিয়ে নিলে। লখুকে কাঁধে চড়িয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়লো। এগিয়ে চললো লাফাতে লাফাতে।

দুখুও গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে। শহরের ইস্টিশানের জাঁকজমক দেখতে দেখতেই এগিয়ে চলেছিল সে। হঠাৎ দুখু দূর থেকে দেখলে একটা ষণ্ডামার্কা লোক লখুকে কাঁধে চড়িয়ে নিয়ে হন্‌হনিয়ে চলেছে। আর কি দুখু থির থাকতে পারে! সঙ্গে সঙ্গে সেও ছুটলো। চেঁচাতে লাগলো—"ছেলেধরা! ছেলেধরা! আমার বোনকে চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে!"

দুখুর একার চিৎকারেই ভোরবেলার ফাঁকা ইস্টিশানের দেওয়াল থাম চেঁচিয়ে উঠলো। লোকজন সবাই চমকে উঠলো। লখুও পাঁড়েজীর কাঁধের ওপর থেকে চেঁচিয়ে উঠলো—"দাদাভাই! দাদাভাই!" পাঁড়েজীও ভয় পেয়ে লখুকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিলে। দৌড়লো নিজেকে বাঁচাবার জন্যে। একদল লোক আর স্টেশনের পুলিশ-পাহারাওয়ালারা হৈ-হৈ করে ছুটলো পাঁড়েজীর পিছু পিছু!

তুখু পাগলের মতো ছুটে এসে লখুকে জড়িয়ে ধরলে। হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করলে—"লোকটা কী করে চুরি করলে তোকে?"

লখু রীতিমতো বিরক্ত হয়ে বললে—"চুরি করবে কেন? ও রাজবাড়ির রাঁধুনী বামুন সেজেছে, আমি রাজকন্যা বকুলমালা হয়ে পালাচ্ছি, একটা মজার খেলারে দাদাভাই!"

তুখু লখুর কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপাগলায় বললে—"কী সব বলছিস্ বোকার মতো যা তা। আসলে লোকটা ছেলেধরা! পালাচ্ছিল তোকে ভুলিয়ে নিয়ে।"

তুখুর কথা শুনে, চারপাশে লোকজনের ছুটোছুটি হৈ-চৈ দেখে লখু রীতিমতো ঘাবড়ে গেল। বোকা বোকা চোখ করে কাঁদো কাঁদো গলায় বললে—"দাদাভাই! শোননা আমার কথাটা।"

তুখু ধমক দিয়ে বললে—"শুনবো আবার কি? আমি সব জানি। তুই মুখ খুলবি না একদম। যা জিজ্ঞেস করবো, শুধু ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলবি, বুঝলি?"

লখু আর কোন কথা বলবারই সুযোগ পেলে না। চারধার থেকে হুড়মুড় করে লোক এসে পড়লো। ভিড় জমে গেল ওদের চারধারে। লখু ভীষণ ভয় পেয়েছে। হাত-পা ছুঁড়ে দিলে। "সত্যি বলছি দাদাভাই! আমি জানতুম নারে ও ছেলেধরা। ও যে বললে রাজবাড়ির রাঁধুনী! আমায় নিয়ে যাবে পরীর দেশে—এঁ—এঁ—এঁ!"

দেখতে দেখতে লখুকে ঘিরে ধরলে ভিড়ের লোকরা, শুরু করলে হাজারও প্রশ্ন। লখু কারো কথার কোনও জবাব দিলে না। শুধু দাদাভাই তুখুর গলা জড়িয়ে হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগলো।

ভিড় ঠেলে হাজির হলো পুলিশের এক দারোগাবাবু। বললে—

"কেঁদো না, কেঁদো না তুমি! চুপ করো!" দুখুকে জিজ্ঞেস করলে—
"তোমাদের নাম কি?"

দুখু চোখ মুছতে মুছতে জবাব দিলে—"আমি দুখু আর এ আমার বোন লখু!"

"তোমাদের বাবা মা কোথায়? বেঁচে আছেন তাঁরা?" জিজ্ঞেস করলেন দারোগাবাবু।

"কিছু জানি না স্যার! বাবা-মাকে চিনিও না, কখনও দেখিনি তাঁদের!" জবাব দিলে দুখু মাথা হেঁট করে।

দুখুর কথা শুনে ভিড়ের ভেতর থেকে কেউ কেউ ঠাট্টা বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠলো। একজন মন্তব্য করলেন—"আরে দূর দূর! ভিখিরী মিখিরীর অপোগণ্ড বাচ্চা!"

দুখু রাগে গর্জে উঠে জবাব দিলে—"মুখ সামলে কথা বলবেন, আমরা ভিখিরীও নই, অপোগণ্ডও নই!"

আর একজন মুখ বেঁকিয়ে ঠাট্টার সুরে বললে—"না হে না, অপোগণ্ড কেন হবে? একজোড়া হীরকখণ্ড!"

"হ্যাঁ হয়তো তাই-ই।" জবাব দিলে দুখু রীতিমতো রুখে উঠে। দারোগাবাবু দুখুর হাতটা চেপে ধরে বললেন—"চটলে চলবে না, চটলে চলবে না। এসো আমার সঙ্গে।"

ভিড়ের ভিতর থেকে একজন বললে—"অনাথ আশ্রমেই ওদের জায়গা।" দুখু ঘাড় ঘুরিয়ে কট্‌মট্‌ করে তাকালে।

দুখুর হাত ধরে লখুকে কোলে উঠিয়ে নিয়ে দারোগাবাবু ভিড় ঠেলে এগুলেন। ভিড়ও চললো পিছু পিছু হৈ-হৈ রৈ-রৈ করে।

সকালবেলা, নাগসাহেবের বাড়ির বারান্দায় তাঁর ছেলেমেয়ে-

গুলো সবাই জড়ো হয়েছে। মুখে তাদের ভয় ভাবনার ছাপ। বুক ভারি লখুর দুঃখে। ভাবনায় কারুর কারুর চোখ জলে ভরা। রোদ ঝলসানো বারান্দায় যেন বিষাদের কালো ছায়া নেমে এসেছে।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নাগ সাহেব পায়চারি করছেন। এদিক থেকে ও'দিকে, বিরক্তি বিষাদে দাঁতে দাঁত চেপে, ভুরু কুঁচকিয়ে। তাঁর গৃহিণীর গলার আওয়াজে রীতিমত লড়ায়ের কাড়া-নাকাড়া বাজছে। দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি হাত পা ছুঁড়ছেন, ছেলেমেয়ে আর স্বামীকে শাসিয়ে। গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছেন—"অনাথ আশ্রমেই মেয়েটার জায়গা। সেখানে না পাঠিয়ে তোমরা সবাই মিলে জুটিয়ে আনলে এখানে। এখন আবার সবাই একজোট হয়ে দোষ দিচ্ছ আমাকে? কেন? আমার অপরাধটা কি শুনি!"

নাগ মশাই বললেন—"অপরাধ সবই আমার! চুপ করো। চুপ করো!"

"কেন চুপ করবো শুনি? তুমিই তো ঐ হতভাগা রাঁধুনী বামুনটাকে চাকরি দিয়েছিলে, তুমিই তো ঘরে আনলে ঐ হতচ্ছাড়ী পেত্নীর ছানাটাকে। সব দোষতো তোমারই! চুপ করবো না, কিছুতেই চুপ করবো না আমি।" বলেই একটুখানি থামলেন নাগগৃহিণী। তারপরেই তেড়ে বেরিয়ে এলেন বারান্দায়। ছেলে-মেয়েগুলোর দিকে চোখ পাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন—"বলি মুখপোড়ারা, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিস কি? বেরো! দূর হ' এখান থেকে! শুনে রাখ তোরা, কারুর কোন হম্বিতম্বি আমি সইবো না। দোষ চাপাবি আমার ঘাড়ে? সেটি হবে না, হবে না, হবে না কিছুতেই।"

ছেলেমেয়েগুলো ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। নাগমশাই লাফিয়ে উঠে ঘুরে দাঁড়ালেন। "বর্বরতা অসভ্যতার একটা সীমা আছে। চেঁচিয়ে আর কেলেঙ্কারী বাড়িয়ো না, তোমার জন্যে আমার মাথা হেঁট হয়েছে যথেষ্ট।" বললেন বেশ কড়া সুরেই। বলতে বলতে গট্‌মট্ করে নেমে গেলেন বারান্দা থেকে বাগানের ফটকের দিকে। দুখুর কাছে গিয়ে কী করে মুখ দেখাবেন! কী বলবেন! সেই ভেবেই তাঁর মনটা তোলপাড় করে উঠলো। বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে।

থানা পুলিশ, যেখানে যাকে খবরটি দেওয়ার সবাইকেই জানালেন তিনি। লখুকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত দুখুকে এখবরটা জানতে না দেওয়ার মতলবেই সেদিন তিনি দুখুদের তাঁবুর ধারে-কাছে গেলেন না।

দশ

আকাশের আঙিনায় বিকেলের রাঙা রোদ্দুর রঙের খেলায় মেতে উঠেছে। অনাথ আশ্রমের ফুলবাগানের মাঝখানেও বসেছে খেলার মেলা। নানা বয়সের উনিশটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নাচছে। হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে। বাজনার তালে তালে গান গেয়ে, হাততালি দিয়ে।

রঙচঙে নতুন একটা ঝক্‌ঝকে ফ্রক লখুর গায়ে। যোগ দিয়েছে সেও ঐ নাচের দলে। নাচছে সে, কিন্তু চোখ দুটো ভয়ভাবনা মাখানো। ভাবছে যেন অন্য কথা। মন নেই তার নাচ-গানে।

অনাথ আশ্রমের ছেলেমেয়েগুলোর দেখাশোনা করবার ভার

যাঁদের ওপর, তাঁদেরই একজন—তরুদিদিমণি, বেহালা বাজাচ্ছেন। হেলেদুলে নাচের তালে সুর মিলিয়ে।

হঠাৎ বুড়ো দরওয়ান রামসিং তেওয়ারী ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজিয়ে দিলে। জানালো, খেলার সময় ফুরিয়ে গেলো, পড়ার সময় হলো। ঘণ্টা কানে পৌঁছতেই নাচ গান থেমে গেল।

ঘণ্টার ঢং ঢং হুকুমেই আশ্রমের কাজ চলে ঘড়ি ধরে। মনটা যার যতই বেতালা থাক, ঘণ্টার তালে তাল মিলিয়ে চলতেই হয় ওখানে।

ঘণ্টার হুকুমেই, রোজদিনের মতো দিদিমণিও হুকুম দিলেন—"সারিতে দাঁড়াও—ডাইনে থেকে গুন্‌তি করো।"

ছেলেমেয়েগুলো সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। লাইনের ডান দিক থেকে, একে একে ছেলেমেয়েরা পর পর হেঁকে হেঁকে বলতে লাগলো—এক-তুই, তিন-চার, পাঁচ-ছয়······সতেরো-আঠারো—উনিশ। গুন্‌তি শেষ হয়ে গেল।

তরুদিদিমণি চমকে উঠলেন, চিৎকার করে বললেন—"উনিশ! একজন কম কেন? কে আসেনি খেলতে?"

লখুর পাশেই যে-ছেলেটি দাঁড়িয়ে ছিল, দিদিমণির কথাটার জবাব দেওয়ার জন্যে তার গলা সুড়সুড় করছিল। কিন্তু যেই-না সে তুখুর নামে 'তু' শব্দটা উচ্চারণ করছে, অমনি লখু ঝট্ করে তার ছোট্ট হাতের চেটোটা দিয়ে ছেলেটার ঠোঁট তুটো চেপে ধরলো। চাপা গলায় চুপি চুপি কাতর অনুরোধ জানালে—"বলিস না ভাই, বলিস না লক্ষ্মীটি!"

ব্যাপারটা তরুদিদিমণির চোখে পড়লো। তিনি গম্ভীর চালে লখুর কাছে এগিয়ে এলেন, বললেন—"তোমার ভাই-ই আসেনি, কোথায় সে? কী করছে?"

"শুয়ে আছে!" জবাব দিলে লখু থতমত খেয়ে।

"হুঁ! কী আবার হলো তার! অসুখ নাকি?" জিজ্ঞেস করলেন তরু দিদিমণি, বেশ খানিকটা ভাবনা নিয়েই।

লঘু আমতা আমতা করে জবাব দিলে—"না দিদিমণি, অসুখ নয়। তবে অসুখের মতো।"

"তার মানে? কী হয়েছে তাই বলো?"

"দাদাভায়ের মাথায় কিসব পোকা ঢুকেছে, পোকাগুলো সারাক্ষণ ওর মাথা কামড়াচ্ছে।" জবাব দিলে লখু, কয়েকটা ঢোক গিলে। একটু থেমেই আবার বললে—"পারলে এক্ষুনি ঐ পোকা-গুলো সব বার করে দিতুম, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না যে!"

দিদিমণি লখুর পিট চাপড়িয়ে বললেন—"বুঝেছি বুঝেছি! ও কিছু নয়, মাথা ধরেছে। এসো তুমি আমার সঙ্গে, কয়েকটা বড়ি দিয়ে দিচ্ছি। তাতেই যন্ত্রণা কমে যাবে।" তারপর তিনি ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন—"পড়তে বসার ঘণ্টা পড়ে গেছে। তোমরা যাও, সবাই হাতমুখ ধুয়ে পড়তে বসোগে।"

ছেলেমেয়েরা চারধারে ছড়িয়ে পড়লে লাইন ভেঙে। ছুটলো সবাই বোর্ডিংয়ের আস্তানার দিকে। লখু চললো তরুদিদিমণির পিছু পিছু আশ্রমের অফিসঘরের দিকে।

থানার হাজত ঘরে পুলিশ আটকে রেখেছে পাঁড়েজীকে। পাঁড়েজী জলভরা চোখে হাজতের দরজার গারদে মাথা রেখে দাঁড়িয়ে আছে। কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। দরজার বাইরে লাল-পাগড়ী মাথায় বাঙালী পাহারাওয়ালাটা পায়চারি করছিল। এদিক ওদিক তাকিয়ে সে বললে—"বাস্তবিক, বড় তাজ্জব ছেলেধরা

বাপু তুমি! যে খুকিটা তোমাকে পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দিলে—কেঁদে মরছো তারই জন্যে! দিনরাত ক'দিন ধরে!”

“নহী জী নহী! ও খোঁকিটার কুছভি দোষ নহি। বিলকুল হামার কপালের দোষ। ভগবান হামার একহী লড়কী লছমিকে লিয়ে গেলো। কো-ই না আসলো তাকে বাঁচাইতে। কো-ই না সাজা দিলো ভগ্‌বানকে—ওহী বেয়াদবীকে লিয়ে। অভী হামি যখন চাইলে লখুকে লছমী করতে, হামি বনলাম ছেলিয়া-ধরা! বচ্চে-চোর! হা ভগবান্! এ হী দুনিয়াকী বিচার!” এই কথাগুলো বলতে বলতে সে কপাল চাপড়িয়ে বসে পড়লো। আরও জোরে কেঁদে উঠলো।

পাঁড়েজীর কথা আর কান্না শুনে ছোকরা পাহারাওয়ালার মন আনচান করে উঠলো। বললে—“এসব খেলাখুলি বলোনি কেন দারোগাবাবুকে? দোষ স্বীকার করে মাপ চাওনি কেন তাঁর কাছে?”

পাঁড়েজী উত্তেজিত হয়ে গারদ দুটো ধরে আবার দাঁড়িয়ে উঠলো। চিৎকার করে বললে—“খুদ ভগবানই যখুন হামাকে কোনও দয়া করলো না। তখুন হামী কেন দয়া মাঙবো এই বেইমান দুনিয়ার বেতমিজ মান্‌সির কাছে! তার চেয়ে হামী জেলে থাকবে, নরকে পচবে, সে ভী আচ্ছা!”

জেলখানার গারদে পচে মরার ইচ্ছে পাঁড়েজীর। দুনিয়ায় ওপর তার অভিমানটা বড় বেশী। মানুষের সংস্রব এড়িয়ে তাই সে আড়ালেই থাকতে চায়।

দুখুর ইচ্ছে, আড়াল থেকে বাইরে আসার। সকল বাধাবিপত্তি, নিয়ম-শৃঙ্খলার বাধা চুরমার করে সে দাঁড়াতে চায় জীবনের কঠোর

লড়াইয়ের সামনাসামনি। সে বাঁচতে চায়। বড় হতে চায় নিজের হিম্মতের জোরে। কদিনেই তাই অনাথ আশ্রমের বাঁধাধরা নিয়ম-শাসনের চাপে হাঁপিয়ে উঠেছে সে।

মাথায় তার সত্যিই পোকা ঢুকেছে। নানান মতলব তার মগজে কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোনও মতলবই সে কাজে লাগাতে পারছে না। ভাল লাগছে না তার অনাথ আশ্রমের খেলা, খাওয়া, নিয়মকানুন কোনটাই। লখুর কিন্তু ভালই লেগেছে অনাথ আশ্রমের ব্যবস্থা বন্দোবস্ত সব কিছুই। দাদাভায়ের সঙ্গে মতের মিল হচ্ছে না এই নিয়েই! কথায় কথায় কথা কাটাকাটি, তর্ক, ঝগড়া।

সেদিন রাত্রে দুখু অনাথ আশ্রমে তাদের ঘরের জানলার গারদ দুটো ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল আকাশের চাঁদের দিকে। হঠাৎ বলে উঠলো—"আমি কিছুতেই এই জেলখানায় থাকতে পারবো না, পচে মরতে পারবো না এই নরকে!"

লখু ছিল ঘরের ভেতরেই। সে তার দাদাভায়ের ঐ কথা শুনে অবাক! শান্তভাবে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল দুখুর কাছে। বললে—"বোকার মতো যাতা বলিস্ না! কী করে বলছিস এটা জেলখানা আর নরক? এখানে এমন সুন্দর ঘর, ধবধবে বিছানা। ভাল ভাল খাবার খাচ্ছি, নতুন জামা কাপড় দিয়েছে। আবার কী চাস তুই?"

দুখু তীরের মতো ধারালো দৃষ্টিতে তাকালো। ঘুরে দাঁড়ালো লখুর দিকে। মনে হলো, তার কটমটে চাউনি দেওয়াল ফুটো ক'রে বাইরে ছুটেছে। গম্ভীর গলায় বললে সে—"লখু, আমি মুক্তি

চাই, মুক্তি চাই, টাকা চাই! বাঁচতে চাই নিজের পায়ে ভর করে। আগাছার মতো কারুর দয়ায় বাঁচতে চাই না, বুঝলি?"

লখু অবাক চোখে তাকালো দাদাভায়ের দিকে। দেখলো দুখুর চোখগুলো জ্বলছে। চোখের কোণে জলের ফোঁটাগুলোও গড়িয়ে পড়তে ভরসা পাচ্ছে না। লখু দুষ্টুমীর হাসি হেসে বললে—"বুঝছিতো সবই। কিন্তু কেমন করে করবি ওসব, আরও বড় না হলে?"

"দেখ লখু! আমি তোর মতো পুঁচকে ছোট্টটি নই, তোর চেয়ে ঢের বড়ো।" জবাব দিলে দুখু নেহাৎ যেন নাক সিঁটকিয়ে।

লখু ঝট করে দৌড়ে গিয়ে দাঁড়ালো দুখুর পাশে। আড়চোখে দুজনের মাপটা দেখে নিয়ে তার আঙুলের কটা গাঁট দেখিয়ে বললে—"ইস্ বড্ড বড়ো। তফাত তো মোটে এইটুকুনি! বড়ো হতে হলে মস্ত গোঁফ চাই মশাই।, কোথায় পাবি শুনি সেটা?"

দুখু এবার ছোট্ট লখুর অবাক-করা প্রশ্নে রীতিমত কাবু। জানলার গারদের কাছ থেকে সরে এসে বসলো বিছানার ওপরে। হেসে রঙ্গ করে জবাব দিলে—"গোঁফের জন্যে ভাবনা কিরে—গোঁফ আমি কিনে আনবো।"

লখু ছুটে এসে খুশীর অমেজে দুখুর গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো। চোখ দুটো গোল গোল করে জিজ্ঞেস করলে—"সত্যি! তাহলে আমার জন্যেও একটা কিনিস কিন্তু দাদাভাই। গোঁফ লাগিয়ে আমিও মস্ত ব্যাটাছেলে হয়ে যাবো।"

দুখুর চোখে মুখে হাসির মালা যেন দুলে উঠলো। হাত বাড়িয়ে লখুর গলা জড়িয়ে ধরলো। তার ঝাঁকড়া মাথার কোঁকড়া চুলগুলো নাড়িয়ে বললে—"তোমার যা পাকা পাকা কথা, দাদা-

মশাই, তাতে তো দেখছি একটা ইয়া লম্বা, পাকা দাড়িই কিনতে হবে তোর জন্যে।”

লখু ঝাঁকুনি দিয়ে তুখুর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সরে দাঁড়ালো। রাগে ফোঁস ফোঁস করে বলে উঠলো—“বয়ে গেছে তোমার দাদা-মশাই হতে! না! দাড়ি আনবে না। ভালো হবে না বলছি, দাড়ি আমি চাই না। বড্ড ভয় করে, ভারী ঘেন্না করে।”

তুখু হাসতে হাসতে হাত-পা ছড়িয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। বললে—“বেশ! বেশ! দাড়ি আমি আনবো না। মস্ত একটা পুতুল কিনে দেবো। তাড়াতাড়ি এখন ঘুমিয়ে পড়। এখ্খুনি আলো নিভে যাবে। ভূতপেত্নীদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার নামবে।”

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলোটা দপ্ দপ্ করে বার দুই জ্বললো নিভলো। জানিয়ে দিলে শুয়ে পড়ার হুকুম।

অন্ধকারের ভয়ে লখু দৌড়ে গিয়ে উঠলো তার খাটে। শুয়ে পড়লো চাদর মুড়ি দিয়ে।

এগারো

ঢং-ঢং! হাসপাতালের ঘড়িতে বারোটা বাজলো। তুখুর ঠাকুরমার চোখে ঘুম নেই। জেগেই শুয়েছিল বুড়ি। মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে হাসপাতালের নার্স। হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল বুড়ির মাথায়। চেষ্টা করছিল ঘুম পাড়াবার।

ঘুম কোথায়! চোখ বুজে বুড়ি বিড় বিড় করে বকছিল কি

যেন আপন মনে। নার্স আর একবার জানালে, রাত অনেক হয়েছে, এখন তাঁর ঘুমোনো দরকার। শুনেই বুড়ি নার্সের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে গজগজিয়ে উঠলো। বললে—"হউক রাইত ঘুরঘুট্টা অন্ধকার। আমার ঘুমানের কামডা কি। আমি ঘুমামু না। জাইগ্যা থাকমু যতক্ষণ না আমার লখু দুখু তাগো মায়ের কোলে ঘুমায়।"

নার্সটি ভারী বুদ্ধিমতী। রোগিনীকে শান্ত করার মতলবে হাসলে মিষ্টি হাসি। চট্ করে জবাব দিলে বেশ একটু আহ্লাদে সুরেই—"ওমা! ঠান্‌দি! জানেন না বুঝি ওরা তো ঘুমিয়ে পড়েছে?"

দুখুর ঠাকুরমা-বুড়ি চোখ বুজলো। হো-হো করে হেসে বললে, "ক্যামনে ঘুমাইবো বাছাগুলান? তাগো মায়েরা কি ঘুম-পারানি গান গায়? কয় কি তারা অগো কাছে গল্প রূপকথা! ঠানদি, ঠাকুরমায় জানে ওগুলা। পারবা, পারবা তুমি আমার ঠানদি অইতে? পারবা ঘুমপারানি গান শুনাইতে? হেইলে আমিও ঘুমামু।"

সঙ্গে সঙ্গে নার্স বুড়ির বিছানার সামনে টুলটাতে বসে পড়ে হেসে বললে—"নিশ্চই পারবো! বেশ। আমি ঘুম-পাড়ানি গান গাইছি। আপনি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন।" বলেই নার্স তার মিষ্টি গলায় হালকা সুরের ঘুম পাড়ানি গান ধরলে।

ঘুম পাড়ানি গানে জাদু থাকে। ভালো গাইতে পারলে ছোটরা কেন, বড়দেরও চোখ জুড়ে ঘুম আসে। কথাটা যে মিথ্যে নয় তখুনি তার টের পাওয়া গেল।

নার্স গান ধরতেই বুড়ি চুপ। বিড়বিড়িনি বন্ধ। চোখ বুজে শান্ত হলো বুড়ি। শুনতে লাগলো—নিশুতি রাতে ঘুম-পাড়ানি গান!

খানিক পরে। গান তখনও চলছে। বুড়ি বিড়বিড় করে আবার নিজের মনেই বলে উঠলো—"লখুরে! লখু অরে অ আমার দুখু সোনা। আমি ঘুমামু—মরার মতো ঘুমামু। আর আমি চোখও খুলুম না, জাগুমও না।"

সত্যি সত্যি বুড়ি দু' মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লো ঘুম পাড়ানি গানের জাদুতেই।

নাগ সাহেবের কিন্তু ঘুম ভাঙেনি যদিও বেলা হয়েছে ঢের। দেওয়াল-ঘড়ির কাঁটা দুটো আটটার ঘরে। সাড়ে আটটা বেজে গেছে। রোদ এসে মাথা খুঁড়ছে ঘরের মেঝেয়। নাগমহাশয়ের তবু টনক নড়েনি। ঘুম ভাঙেনি। দুখু-লখুর খোঁজ করে হয়রাণ হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন কাল অনেক রাত করে তাই!

ঘরে ঢুকল নাগ সাহেবের ছোট মেয়ে রানী। হন্তদন্ত হয়ে ভয় পেয়ে। বাপকে ঠেলাঠেলি করে ধাক্কা মেরে ডাকলে—"বাবা! বাবা! ওঠো ওঠো শিগগিরী, থানা থেকে পাহারাওয়ালা এসেছে।"

মেয়ের চিৎকার ঠেলাঠেলিতে নাগ সাহেব ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন বিছানার ওপর। চোখ রগড়াতে রগড়াতে আড়মোড়া ভেঙে বললেন, "যাক! শেষ পর্যন্ত পুলিশ যে এসেছে, এতেই খুশি আমি!

রানী বোকা বোকা চোখে বিস্ময় আর বিরক্তির আমেজ মিশিয়ে প্রশ্ন করলে—"পাহারাওয়ালা এলে লোকে তো ভয় পায়, খুশি হয় নাকি? পাহারাওয়ালারা লোকেদের কষ্ট দেয়। দড়ি বেঁধে নিয়ে যায়, মারে!"

"নারে না! পাহারাওয়ালা পুলিশের কাজই হলো লোকের

সাহায্য করা। শুধু যারা দোষ করে, অপরাধ করে, তাদেরই ওরা বেঁধে নিয়ে যায়। শাস্তি দেয়।" বলতে বলতে নাগ সাহেব বিছানা থেকে নেমে চটিতে পা গলালেন, বাইরে যাওয়ার জন্যে।

রানী ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো তাঁকে, জিজ্ঞেস করলে—"তুমি তো কিছু দোষ করনি! পাহারাওয়ালা তবে এলে কেন?"

"এতদিনের পর হয়তো পুলিশ খোঁজ পেয়েছে লখু আর ঐ পাঁড়েজী বদমাইসটার।" নাগ সাহেব বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

রানী আনন্দে হাততালি দিয়ে বলে উঠলো—"কী মজা হবে, খবরটা যদি সত্যি হয়!"

"সত্যি দাদাভাই, একেবারে সত্যি!" লখু হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে এসে ঢুকলো অনাথ-আশ্রমের ওদের ঘরটার ভেতরে। বললে—"সার্কাসের লোকটা তোর দরখাস্ত মঞ্জুর করেছে। ওরা আমাদের সবাইকে আজই সার্কাস দেখতে যাওয়ার নেমতন্ন করেছে।"

দুখু চমকে উঠে তাকালো শুধু লখুর দিকে। জবাব দিলে না সে। মুখে দেখা গেল আনন্দের বদলে ভয়, বিরক্তি।

লখু আরও ভরসা দিয়ে বললে—"জানিস দাদাভাই। সক্কলে তোর খুব প্রশংসা করলে, যখন আমি বললাম তুই চিঠিটা ডাকে দিয়েছিলি।"

দুখুর মুখটা আরও গম্ভীর, আরও ভারী হয়ে উঠলো। হুস্ করে পড়লে দীর্ঘনিশ্বাস। বললে—"কেন তুই বলতে গেলি! আমার কপালে কেন দুঃখ ডেকে আনলি। ওরা আমায় বকবে, শাস্তি দেবে।"

"তোকে শাস্তি দেবে! কেন? তুইতো কোনও অন্যায় করিসনি!" বললে লখু বিস্ময়-মেশানো ভয়ে।

দুখু তখন ছটফট করতে শুরু করেছে। ছেলেমানুষদের বিবেক যখন কামড়ায়, তখন তারা দিশে হারিয়ে ফেলে। অন্যায় করেছে বুঝতে পারলে তারা নিজেরাই নিজেদের শাস্তি দিতে চায়! লজ্জা পায় বড়োদের চেয়ে ঢের বেশী। দুখু সেই যন্ত্রণাতেই অস্থির হয়ে উঠেছে। ঘরের ভেতর পায়চারি করতে করতে জবাব দিলে—"অন্যায় বৈকি! আশ্রমের আইন-কানুন না-মানাটা মস্ত অপরাধ। আমি তো ও চিঠি ডাকে দিইনি। গয়লার হাত দিয়ে চোরাই-চালান করেছিলাম।"

"তাই-ই যদি করে থাকিস, তাতে কি এমন দোষ হয়েছে! নিজের জন্যে তো করিসনি? আর পাঁচজনের ভালোর জন্যে, সব ছেলেমেয়ের জন্যেই তো!" জবাব দিলে লখু বেশ একটু মাতব্বরী চালেই।

দুখুর মনটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে বড্ড বেশী। ভাবনার আকাশ ভেঙে পড়েছে সহসা তার মাথায়। লখুর কথা শেষ করতে না দিয়ে সে হতাশার সুরে বললে—"পাঁচজনের ভালো করতে গেলেই দুখ্যু! যাক! যা হবার হোক।" বলেই দুখু বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

দাদাভায়ের চোখ মুখের ভাবভঙ্গি দেখে লখুর আপসোসের অন্ত রইল না। মুখখানা কাঁচুমাচু করে, বেচারা ভয়ে বিছানায় হুমড়ি খেয়ে পড়লো। কাঁদতে লাগলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

নাগ সাহেবের মেয়ে রানীও বিছানার ওপর পড়ে কাঁদছিল। পাহারাওয়ালার কাছ থেকে সব খবর নিয়ে নাগসাহেব ঘরে ঢুকেই

দেখলেন রানী কাঁদছে। জিজ্ঞেস করলেন—"কি হলো আবার! কাঁদছিস কেন মা?"

রানী আরও জোরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। জবাব দিলে না তাঁর প্রশ্নের। নাগ সাহেব এগিয়ে গিয়ে রানীকে কোলে তুলে নিয়ে চোখ মুছিয়ে দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন—"মা বুঝি কিছু বলেছে?"

রানী ঘাড় নাড়লে—চাপা গলায় বললে "হুঁ! মা বলেছে লখুকে আর এ বাড়িতে ঢুকতে দেবে না। তাহলে ও কোথায় থাকবে?"

"সে ভাবনার দরকার হবে না। পাহারাওয়ালার কাছে সব খবর পেয়েছি। ওর ঠাকুরমা হাসপাতালে ভালো হয়ে উঠছে। তিনি ফিরে এলেই লখুদের জন্য একটা নতুন বাড়ির ব্যবস্থা করে দেবো—নতুন উদ্বাস্তু পল্লীতে।" জবাব দিলেন নাগ সাহেব।

"সব উদ্বাস্তুদের নতুন বাড়ি হবে বাবা!"

নাগ সাহেব হেসে শুধু ঘাড় নাড়লেন।

রানী হাততালি দিয়ে বলে উঠলো—"লখুদের নতুন বাড়ি হলে, ওর ঠাকুরমা ফিরে এলে আমাকে তুমি নিয়েযাবে? কী মজা হবে!"

বারো

অনাথ আশ্রমে রোজই আসে জটাধর গয়লা। ছেলেমেয়েদের জন্যে বরাদ্দ দুধের যোগান দিতে। জটাধর নামটা ভয়-পাওয়ানো। মানুষটা কিন্তু ভালো। মাথাতে তার জটাও নেই, মনটাও জট-পাকানো নয় এতটুকু। আশ্রমের বন্দী ছেলেমেয়েগুলোর দুঃখ-কষ্ট

তার মনে করুণা জাগায়। দুধ যোগান দিতে আসার সুযোগটা মাঝে মাঝে কাজে লাগায়। আড়ালে আবডালে ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দিয়ে যায় লজেন্স, ডালমুট। যুগিয়ে দেয় বাইরের জগতের নানা হাসি-খুশির ছিটে-ফোঁটা, খোশ-খবর।

রয়াল সার্কাস কোম্পানীর খবর দুখুকে সে-ই যুগিয়ে দিয়েছিল। গল্প করে হাত-পা নেড়ে বলেছিল, সার্কাসের তাক-লাগানো খেল্-কসরতের কথা। শুধু তাই নয়, সার্কাসের ম্যানেজার, রিং-মাস্টার, খেলোয়াড়রা সবাই যে তার দুধ কেনে, সবাই যে তাকে চেনে, দুখুকে তাও শুনিয়েছিল জটাধর।

ওসব কথা শুনেই দুখুর মাথায় মতলব খেললো। কারুর নামটাম না দিয়ে, কাউকে কিছু না জানিয়ে, বেশ করুণ ভাষায় একটা চিঠি লিখেছিল রয়াল সার্কাসের ম্যানেজারের কাছে।

চিঠিটার সারমর্ম—অনাথ আশ্রমের অভাগা ভাই-বোনেরাই সার্কাসের ম্যানেজারের কাছে আবেদন জানাচ্ছে, তিনি যেন দয়া করে একদিন আশ্রমের ছেলেমেয়েদের সবাইকে বিনা-পয়সায় সার্কাস দেখান। চিঠিটার তলায় নিজের নাম না লিখে দুখু লিখেছিল 'অনাথ আশ্রমের অভাগা ভাইবোনেরা'।

চিঠিটা জটাধরের হাতেই পাচার করেছিল। জটাধর কথা দিয়েছিল এ খবর সে কাউকে বলবে না। আবেদন মঞ্জুর করিয়ে সকলের সর্কাস দেখার নেমন্তন্ন-পত্রটা এনে পৌঁছে দেবে আশ্রমের বড়মার কাছে।

জটাধর কথা রেখেছে। আবেদন মঞ্জুর করিয়ে সকলের সার্কাস দেখার নেমন্তন্ন আর পাস এনে দিয়েছে; কিন্তু কী করে কার চেষ্টায় যে এটা সম্ভব হয়েছে, জটাধর কাউকেই বলেনি সেসব কথা।

ছুখুও কাউকে বলেনি, লখুকেই শুধু বলেছিল চিঠি লেখার কথাটা। আনন্দের চোটে লখুই কথাটা ফাঁস করে দিয়েছিল, দাদাভায়ের বাহাছুরিটা প্রমাণ করতে।

তাতেই ছুখু ঘাবড়ে গিয়েছিল। নিজের অপরাধ নিজে বুঝতে পেরে ভয় পেয়েছিল, বিরক্ত হয়েছিল। সার্কাসে যাওয়ার আনন্দে আর মজায় আর সকলের মতো মন তার মেতে ওঠেনি। তেতে উঠেছিল, আপসোস অনুশোচনার তাপে।

সারাটা দিনই কেটেছে তার ভয়ে ভয়ে। আশ্রমের দিদি-মণিদের সবাইকে, বড়মাকে সে এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছে। সারাদিনে যখন কেউ তাকে ডাকলো না, কেউ তাকে বকলো না, তখন ভয়ের মধ্যেই তাকে ভরসা দিলে লখুই আবার। বললে—"মিছিমিছি তুই ভয় পাচ্ছিস, কেউ কিছু বলবে না তোকে। সবাই সার্কাসে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে, তুইও জামা পরে নে দাদাভাই। লক্ষ্মীটি চল ভাই।"

লখুর পীড়াপীড়িতেই ছুখু জামা পরে তৈরি হলো। বুকে ভয় নিয়ে দিদিমণিদের ডাক পড়তেই আশ্রমের ছেলেমেয়েদের সকলের পিছনে গা-ঢাকা দিয়ে ভয়ে ভয়েই সে সার্কাসে চললো। সার্কাস যাওয়ার আনন্দে সবাই মেতে উঠেছে। ছুখু চলেছে মনমরা হয়েই! কেবলই তার মনে হচ্ছে—আজ না হলেও কাল তার কপালে ছুঃখ আছে, শাস্তি আছে। কি করে সেই শাস্তি এড়ানো যায়! ভাবতে ভাবতে চললো সে সারাটা পথ।

সার্কাসের তাঁবুতে আশ্রমের ছেলেমেয়েরা ঠিক সময়েই পৌঁছে গেল। আরও হাজার হাজার ছেলেবুড়ো টিকিট কিনে ঢুকেছে।

চেয়ারে, গ্যালারীতে লোক ঠাসা। চারধারে বড় বড় চোখ ঝলসানো বিজলী বাতি।—তাঁবুটাকে দিনের মতো আলো করে তুলেছে। খেলা শুরু হয়েছে সবে। তালে তালে মিষ্টি বাজনা বাজছে সার্কাসের গোল খেল-চত্বরটার পাশে, কালো পর্দা লাগানো ফটকের ওপর উঁচু জায়গাটায়।

গ্যালারীর মাঝামাঝি জায়গার হুটো সারিতে বসেছে আশ্রমের ছেলেমেয়েরা ভাগাভাগি করে। ওরা অবাক চোখে সবাই দেখছিল হাতির খেলা।

ছোট বড় নানা মাপের কয়েকটা হাতি বসলো—ওল্টানো কাঠের ডাবার ওপর, সামনের পা হুটো আর শুঁড়টা ওপরে তুলে। চেয়ারে বসার ভঙ্গিতে। ছোট বড় সকলেই হাততালি দিয়ে উঠলো। ছেলেমেয়েরা হেসে লুটোপুটি। হুখুও হাততালি দিয়ে ফেলল আনন্দের চোটে। ভয় ভাবনার মেঘ তখন সরে গেছে। খুশির ঝড়ো হাওয়ায়।

হুখুর পাশেই যে ছেলেটি বসেছিল, সে কিন্তু হাততালি দিলে না। হুখু ব্যাপারটা লক্ষ্য করলে। চুপ করে থাকতে না পেরে পট্ করে ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলো—"হাততালি দিলি না যে?"

ছেলেটি জবাব দিলে—"জানিস, ওদের কত কষ্ট হয়, ওসব করতে?" "বাহাহুরি দেখাবার মতো কিছু করতে হলে কষ্ট করতেই হবে।" জবাব দিলে হুখু।

খেলা শেষ করে হাতিরা পর্দার আড়ালে চলে গেল। নাচতে নাচতে ঢুকলো একটা মোটাসোটা ভারি সুন্দর সাদা টাট্টু ঘোড়া। পিঠে তার নাচছে পরীর মতো আঁটসাঁট পোশাক আর রংচঙে ফ্রকপরা পনেরো ষোলো বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে। ঘোড়ার

পিঠে হাত ছেড়ে দাঁড়িয়ে, মিষ্টি হেসে মাথা নুইয়ে, সকলকে সে অভিবাদন জানালো।

চারধার থেকে দর্শকরা সবাই গুন্‌গুন্ করে উঠলো—"চন্দ্রলেখা! চন্দ্রলেখা!"

অবাক চোখের আদর মাখিয়ে, ভালো করে মেয়েটিকে দেখে নিলে লখু। নীচের থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলো—"দাদাভাই! পরী বুঝি?"

দুখু ফিরে তাকালো লখুর দিকে। তার নিজের ঠোঁটের ওপর আঙুল চেপে লখুকে ইশারা করলো—চুপ করতে।

চন্দ্রলেখা ঘোড়ার পিঠে রকমারি খেলা দেখিয়ে কসরৎ কেরামতী করে সবাইকে একেবারে মাতিয়ে তুললে। বার বার সবাই হাততালি দিয়ে তার খেলার তারিফ করলে।

আরও কয়েকটা খেলা দেখানো হলো। ক্লাউনগুলোর ভাঁড়ামী আর মজা দেখে ছেলেবুড়োর হাসির হর-রা উঠলো।

শুরু হলো, জাদুর খেলা। কালো জেব্বা-পরা জাদুকর হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা দিলে। জানালে—সকলের চোখের সামনে, এখুনি সে একটা আস্ত মানুষকে ফুস্-মন্তরে উড়িয়ে দেবে। অদৃশ্য করবে।

সবাই চুপচাপ! দুখুরও দমবন্ধ। অসীম কৌতূহল নিয়ে চোখ দুটো সে মেলে দিলে সেই দিকে। চোখের পাতা না ফেলে তাকিয়ে রইল। জাদুকরের খেলাটা মন দিয়ে দেখবার জন্যে।

মস্ত একটা রঙচঙে কাঠের সিন্দুক। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জাদুকর সেটার চারধার সকলকে দেখালেতার পর তার ভেতরেঢুকিয়ে দিলে দুখুরই বয়সী একটা ছেলেকে! তালাচাবি বন্ধ করে দিলে! দুখুর চোখ দুটো অন্য সব ছেলেমেয়েদের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠলো।

"গিল-গিলি-গিলি গালি-হিং-টিং ছট-ফুং ফিং ফট" মন্ত্র আউড়ে জাদুকর তার জাদুকাঠিটা বাক্সর গায়ে তিনবার ঠুকে দিলে। তারপর আবার সিন্দুকটা খুলে কাৎ করে দিলে। কোথায় ছেলেটা! কেউ নেই ভেতরে!

সবাই অবাক আর খুশি হয়ে পটাপট্ হাততালি দিলে। দুখু এই খেলাটা দেখতে দেখতে এমনই তন্ময় হয়ে গেছলো যে, সে হাততালি দিতে ভুলেই গেল।

দুখুর পাশের সেই ছেলেটি এবার দুখুকে ঠেলা মেরে বললে— "এই তুই যে এবার হাততালি দিলি না বড়?"

দুখুর হুঁশ ফিরলো। আস্তে আস্তে হাততালি দিতে দিতে বললো—"মানুষ উড়িয়ে দেওয়ার প্যাঁচটা যদি শিখতে পারতুম রে!"

দুখুর ঐ কথা লখুর কানে যেতেই লখু শিউরে উঠলো। চট্ করে দাদাভাইয়ের পায়ে একটা চিমটি কেটে চোখ পাকিয়ে ইশারা করলে। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে কাছেই অনাথ-আশ্রমের যে মোটা দিদিমণিটি বসে ছিলেন, তাঁকে। দুখু চট করে সামলে নিলে নিজেকে।

এরপর রকমারি রঙের জাঙিয়া আর জামা-পরা পাঁচ-সাতটা ছোট ছোট বাচ্চা ছেলেমেয়ে টপাটপ ডিগবাজি খেতে খেতে— ঢুকে পড়লো সার্কাসের খেল্-চত্বরে। মস্ত ডিগবাজি খেয়ে সে কী হুল্লোড়! দশ বারো রকমের জিমনাস্টিক দেখিয়ে তারা সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলে। ছোটদের প্রতিটি খেলাই ভারি মজার। খুব চমৎকার! প্রতিবারই তাই হাততালি পড়লো খুব জোর।

দুখুও খুব মেতে উঠলো ওদের খেলা দেখে। পাশের

ছেলেটিকে প্রশ্ন করলে—"হ্যাঁরে! ওরা নিশ্চয়ই খুব অনেক টাকা মাইনে পায়?"

ছেলেটি মুরুব্বিয়ানা চালে ঘাড় নেড়ে জবাব দিলে—"হুঁ"।

দুখু এবার কেমন যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠলো। উস্‌খুস্‌ করে নড়ে বসলো। খেল্‌-চত্বরের চারধারে লোহার খাঁচা খাটিয়ে বাঘ সিংহী ছেড়ে দেওয়া হলো। ছোটরা সবাই বেশ একটু গা ঘেঁষাঘেষি করে বসলো। দুখু কিন্তু তেমন করে মনই দিলে না সেদিকে। দেখলে না বাঘ-সিংহীর খেলাটা। বনের রাজা বাঘ-সিংহীকে পেটভরে খেতে না দিয়ে খাঁচায় ভরে রাখা। অমন করে তাদের চারধার থেকে খুঁচিয়ে ভয় দেখিয়ে চাবুক মেরে খেলা দেখানো! তার মধ্যে বাহাদুরিটা কোথায়! সে ভেবে পেলে না। দেখতে পেল অত্যাচার শাসনের বর্বর চেহারাটা।

বাঘ-সিংহীর খেলা শেষ হতেই সার্কাস ভেঙে গেল। চড় বড় করে বাজনা বেজে উঠতেই হুড়মুড় করে লোক উঠে পড়লো।

সার্কাসের বাইরে বেরিয়ে আশ্রমের সেই মোটা দিদিমণি ছেলেমেয়েগুলোকে সার দিয়ে দাঁড় করিয়ে একবার গুণে মিলিয়ে নিলে। কিন্তু অত লোকের ঠেলাঠেলিতে ছেলেমেয়েগুলো লাইন ভেঙে ছিটকে ছড়িয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। তাঁবুর বাইরে আবছা আলো-অন্ধকারে তারা যে যার পথ খুঁজে নিয়ে মোটা দিদিমণির দিকে চোখ রেখে এগুতে লাগলো।

দুখু কি যেন ভাবলো। টপ করে লখুর হাত ধরে কাছে টেনে নিলে। তার কানে কানে বললে—"তোর পুতুল আর গোঁফটা নিয়ে আসি। কাউকে বলিসনি কিন্তু।"

লখু চারপাশ দেখে নিয়ে, আড়চোখে শুধু বললে—"বলবো না! কখন ফিরবি ?"

"যত তাড়াতাড়ি পারি।" বলেই দুখু লখুর হাত ছেড়ে দিলে।

পাছে কারুর চোখ পড়ে দুখুর দিকে, তাই লখু হাত নেড়ে ঝট্‌পট্ দুখুকে গা ঢাকা দিতে ইশারা করলে। দুখুও অন্ধকারে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। গোলমাল হট্টগোল আনন্দ উত্তেজনায় কেউ টের পেলো না—ওদের ভাইবোনের মতলবটা।

তেরো

সার্কাসে খুশির খোরাক মনভরা। পেটের খোরাক তো জোটেনি ছেলেমেয়েদের তেমন কিছু। তাই সার্কাস থেকে ফিরেই তারা কোনও রকমে হাতমুখ ধুয়ে ছুটে এসেছে খাবার ঘরে। খেতে বসেছে যে যার থালা গেলাস সামলে নিয়ে।

লখুরও খুব খিদে পেয়েছিল। কিন্তু দাদাভায়ের কথা ভেবেই ভয়ে তার পা চলছিল না খাবার ঘরের দিকে। দু' পা এগোয় তো তিন পা পেছিয়ে আসে। কাজেই খাবার ঘরে ঢুকল লখু একটু দেরি করেই পা টিপে টিপে চোরের মতো। গা-ঢাকা দিয়ে ঢুকে পড়লো খাওয়ার সারিতে।

তরুদিদিমণির চোখ পড়লো লখুর দিকে। পরিবেশন করতে করতে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন—"তোমার দাদা কই ? কী নিয়ে ব্যস্ত তিনি ?"

লখু না ভেবে-চিন্তে, বোকার মতো বলে বসলো—"গোঁফ নিয়ে!"

"কী! কী নিয়ে!" চোখ ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলেন তরুদিদিমণি।

লখু ঘাবড়ে গিয়ে—তুহাত দিয়ে গোঁফ পাকানোর মজার ভঙ্গি করে তোৎলাতে তোৎলাতে বললে—"গোঁ-ও-ফ্! বড় হবার জন্যে।"

ছেলেমেয়েরা সবাই লখুর ভঙ্গি দেখেই হো-হো-করে হেসে উঠলো। ওদের হাসির হররায় তরুদিদিমণি আসল কথাটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। চটে মটে সবাইকে ধমক লাগালেন—"চুপ! চুপ! চুপ সব্বাই!" লখুর কাছে এগিয়ে এসে তাকে ধমকালেন, বললেন—"সব সময় অমন হাসি মশকরা করা উচিত নয়।

লখু তার ভুলটা বুঝতে পেরে একেবারে নেহাৎ ভালমানুষটির মতো ঘাড় নাড়লে। বেফাঁস কথাটা সাম্‌লে নিয়ে বললে—"না দিদিমণি, অন্যায় হয়েছে। দাদাভায়ের মাথায় পোকা"...

"পোকা নয়রে বোকা। পোকা নয়। সার্কাসের আলোয় মাথা ধরেছে। তুমি খেয়ে নাও, ভেবোনা কিছু। আমি বড়ি এনে দিচ্ছি।" লখুর কথাটা শেষ করতে দিলেন না তিনিই।

বলেই তরুদিদিমণি খাওয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ফাঁড়াটা কাট্‌লো। লখু হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। দাদাভায়ের কথা ভাবতে ভাবতে আনমনা হয়ে সে রুটি তরকারি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো। খেতে বসেও খেতে পারে না কিছুতেই।

দলছাড়া হয়ে ভিড়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয় নি তুখু। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে; সার্কাসের বাইরে টিনের বেড়া দেওয়া জায়গাটার আনাচে কানাচে। উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখেছে, ওর ভেতরে সার্কাসের লোকজন, হাতি ঘোড়া সব রয়েছে। সার্কাসের চেয়ে ওখানেই বেশী মজা, বেশী রহস্য। তুখু ওর ভেতরে

ঢুকে দেখবে, ভাব করবে। খোঁজ করবে সার্কাসের চাকরি মেলে কিনা। তাই সে নড়লো না ওখান থেকে।

বেড়ার চারধারে ঘুরে আবিষ্কার করলে, এক জায়গায় টিনটা একটু আল্‌গা। অন্ধকারের আড়ালে খুব সাবধানে টিনটা ফাঁক করে দুখু ঢুকে পড়লো সার্কাসের জানোয়ার-খানার ভেতরে।

ভেতরটা তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। আলোগুলো সব নিভে গেছে। দুখু দেখলে—চারপাশে হাতি ঘোড়া উটের কালো কালো ছায়ামূর্তি নড়ছে চড়ছে। শুনলে খস্‌-খস্‌, কচ্‌-মচ্‌ আওয়াজ! জানোয়ারগুলো খড়কুটো ডালপালা চিবুচ্ছে। ভয়ে ভয়ে তাদের পাশ কাটিয়ে দুখু পা টিপে টিপে এগুতে লাগলো। হঠাৎ কে যেন বাজখাঁই গলায় হাঁক মারলে—"কোন্ যাতা হ্যায়?"

দুখুর বুকটা কেঁপে উঠলো। ছুটে গিয়ে চাকাওয়ালা একটা খাঁচা গাড়ির পেছনে লুকোলো। খাঁচা-গাড়িটার ভেতরে ডোরাকাটা বাঘটা ঘুমুচ্ছিল। মানুষের গন্ধ আর পায়ের শব্দ পেয়েই "হালুম হালুম" হাঁক ছাড়লে।

গজরাতে লাগলো গর্‌-র্‌—র-র গোঁ-গোঁ করে।

দুখুর পা দুটো কাঁপছে থরথর করে। সে একেবারে ভয়ে ভাবাচাকা খেয়ে গেছে, পালাবার পথও নেই, ক্ষমতাও নেই! সঙ্গে সঙ্গে যমদূতের মত যণ্ডা-গুণ্ডা পাহারাদারটাও লাফ মেরে হাজির তার সামনে। দাঁত খিঁচিয়ে বললে—"কোন্ রে শয়তান তুম্?"

দুখু কাঁপা গলায় ভয়-চাপা সুরে জবাব দিলে—"আমি দুখু! এসেছিলুম একটা দরকারে।······"

"কী দরকার হামি জানে। তুম্ চোট্টা হো।" বলেই পাহারাদার দুখুকে পাকড়াও করলে। বগলদাবা করে নিয়ে গেল হিড়

হিঁড় করে টেনে। রাতের পেঁচা যেমন করে খরগোশের ছানা ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। দুখুর কান্না ভেসে গেল, দূরে, আরও দূরে অন্ধকারের ভেলায়।

কাছে, তরুদিদিমণির খুব কাছটিতে বসে লখু তখনও গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদছে। দাদাভাই ফিরে না এলে একলাটি সে ঘরে শোবে কী করে! ভূতের ভয়, চোরের ভয় তার মাথার ভেতরে। সেই ভয়েই তার বুক কাঁপছে, ঠোঁট কাঁপছে। চাপতে চেষ্টা করেও পারছে না কান্না চাপতে। রুটি নিয়ে বার বার দাঁতে কাটছে আর চোখ মুছছে।

সকলে খাওয়া শেষ করে যে যার ঘরে চলে গেছে। লখুই শুধু যেতে পারেনি। খাওয়া তখন শেষ হয়নি তার। তরুদিদিমণি এসে খেতে বসেছেন লখুর সামনের টেবিলেই।

লখু বার বার চোখ মুছছে। মাঝে মাঝে চাপা কান্না ঠোঁট-গুলোকে কাঁপাচ্ছে তার। তরুদিদিমণি লক্ষ্য করেছেন সেটা। জিজ্ঞেস করলেন—"কী হলো! কাঁদছিস্ কেনরে?"

লখু কাঁদো কাঁদো গলায় জবাব দিলে—"দাদাভায়ের কাছে শোবো না। ভয় করছে, পোকাগুলো যদি আমার মাথায় ঢোকে।"

তরুদিদিমণি হো-হো-করে হেসে উঠলেন। বললেন—"এই কথা! তার জন্যে আর ভাবনা কি! আমার কাছেই না হয় শুবি। কাঁদিস না বাপু! চুপ কর।"

ভয় যখন ভয়ঙ্কর সাজ পরে আচমকা এসে পড়ে, তখনই অভয়া এসে ভরসার হাত তুলে এগিয়ে দেয়। অন্ধকারের পেছনে আলোই

এগিয়ে আসে। ভাবনার অন্ধকার থেকে সান্ত্বনার আলোতেই এসেছে দুখু।

দুখু খেতে বসেছে সার্কাসের ছোট একটা তাঁবুতে। রিং-মাস্টারের খাবার টেবিলেই। রিং-মাস্টারের দয়া হয়েছে দুখুর চেহারা দেখে, কথা শুনে। তাই মারধোর খাওয়ার বদলে দুখুকে খাওয়ার অনুরোধ করেছে রিং-মাস্টার। দুখু খেতে পারছে না। গলা দিয়ে পেরুচ্ছে না এক টুকরো খাবারও। কান্নায় গলা বুজে আসছে, খাবার আটকে যাচ্ছে। কাঁদছে দুখু ভয়ে ভাবনায়।

দুখুকে কাঁদতে দেখে রিং-মাস্টার বললে—"কাঁদিস না বেটা! খেয়ে নে। ভাবনা কি! এখানে থাকবি, খেল শিখবি, মাইনে পাবি। কিন্তু হামার হুকুম মানতে হোবে, হামি রিং-মাস্টার। মানবি তো?"

দুখুর চোখের কোল চিক্ চিক্ করে উঠলো। জলের ফোঁটা-গুলো গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো কৃতজ্ঞতায়। দুখু চোখ মুছে শুধু ঘাড় নাড়লে। বাঁ হাত দিয়ে চোখের জল মুছে নিলে। মুখে পুরলে এক গরাস মাংস আর রুটি।

চৌদ্দ

পুলিশের কাছ থেকে খবর পেয়েছেন নাগ-সাহেব। নিশ্চিন্তও হয়েছেন অনেকখানি। জেনেছেন দুখু লখু অনাথ আশ্রমে ঠাঁই পেয়েছে। কিন্তু ক'দিন কাজের ঝড়ে ঘুরপাক খাচ্ছিলেন তিনি। সময় করে সঙ্গে সঙ্গে আসতে পারেননি শহরে। দুখু-লখুর খোঁজ নিতে।

এলেন তিনি, দুখু পালিয়ে যাওয়ার দিন তিনেক পরে। শুনলেন সব কথা, অনাথ আশ্রমের দিদিমণিদের মুখ থেকে। দিদিমণিদের কাছে লখু বলেছে, পাঁড়েজী তাকে চুরি করেনি। নিয়ে যাচ্ছিল তাকে মকাই-চানার দেশে, পরীর দেশে। দাদাভাই দুখু তার কথা বিশ্বাস করেনি। শুধু শুধু ধরিয়ে দিয়েছে পাঁড়েজীকে পুলিশের হাতে। দিদিমণিরা সেই সব কথাই বললেন নাগ-সাহেবকে। সব শুনে, নাগ-সাহেবেরও মনে হলো—'তাই হবে!' তাঁর স্ত্রী মেয়েটাকে অমন করে কষ্ট দিতেন দেখেই পাঁড়েজীর মনটা হয়তো বিদ্রোহ করেছিল। হয়তো লখুর দুঃখ ঘোচানোর জন্যই তাই সে পালিয়েছিল বাড়ি থেকে।

ভাবলেন এমনি অনেক কথাই তিনি। পাঁড়েজীর ওপর রাগটা তাঁর অনেকখানি পড়ে গেল। যত রাগ পড়লো গিয়ে তাঁর নিজের স্ত্রীর ওপরেই। মনের রাগ মনে চেপে দুখু-লখুর দুঃখের কথা ভেবে তিনি যেন আনমনা হয়ে গেলেন। দিদিমণিরা লখুকে অনাথ-আশ্রমের অফিসঘরে ডেকে পাঠালেন।

ছোট্ট লখু, তার ছেলেমানুষী আনন্দ আর কৌতূহল নিয়ে নাচতে নাচতে অফিসঘরে ঢুকলো। নাগ-সাহেবও হাত বাড়িয়ে তাকে কোলে তুলে নিলেন। চুমো দিলেন তার দু-গালে দুটো।

নাগ-সাহেবের কোলে চড়ে আদর পেয়ে লখু আবার তার আব্দার শুরু করলে। বায়না ধরলে নাগ-সাহেবের সঙ্গে যাওয়ার জন্যে।

নাগ-সাহেব আদর করে লখুর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন— "এঁদের কাছেই থাকো আর ক'টা দিন। তোমার ঠাকুরমা ভাল হয়ে উঠুন, দুখু ফিরে আসুক। তারপর তোমাদের সকলকে নিয়ে যাবো তোমাদের নতুন বাড়িতে।

লখু আনন্দে বিস্ময়ে হাত-তালি দিয়ে বলে উঠলো—"কী মজা হবে জানো? আমরা নতুন বাড়িতে যাবো মস্ত মস্ত গোঁফ নিয়ে! তোমার মতো বড় হয়ে। ঠাকুরমা একদম অবাক হয়ে যাবে।"

অনাথ আশ্রমের বড় দিদিমণি, তরুদিদিমণি, সবাই লখুর কথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠলেন। তরুদিদিমণি নাগ-সাহেবকে বললেন—"ওর কথাবার্তাই অমনিধরা, জিবটা ওর মগজে ঘোরে। হাসিয়ে মারে সবাইকে। কিন্তু ভারী মিষ্টি, একেবারে লক্ষ্মী!"

লখু আড়চোখে তাকিয়ে ঘাড় নাড়িয়ে বললে—"নাগো! না! আমি লক্ষ্মীর পেঁচা। নাগ-সাহেব জানে—ঠাকুমা বলেছে তাই।"

সবাই আবার হেসে উঠলো। লখুও হেসে উঠলো ছেলেমানুষী গর্বে। নাগ-সাহেব তখন আস্তে আস্তে পকেট থেকে বার করলেন ঠোঙা ভর্তি লজেন্স আর চকোলেট। দিলেন লখুর হাতে।

লজেন্স চকোলেট পেয়েই লখু নাগ-সাহেবের কোল থেকে নেমে পড়লো—বললে—"সব্বাইকে দিয়ে আসি?"

নাগ-সাহেব ঘাড় নাড়লেন—লখু ছুটে পালালো আশ্রমের বন্ধুদের কাছে। নাগ-সাহেবও মায়া কাটিয়ে সরে পড়লেন। লখুকে আরও কিছুদিনের জন্যে অনাথ আশ্রমে রাখার অনুরোধ জানিয়ে।

লখুকে ছেড়ে যেতে তাঁর খুবই কষ্ট হলো। কিন্তু উপায় তো নেই। তাঁর বাড়ির চেয়ে এখানে অনেক আনন্দে আছে। এই তাঁর সান্ত্বনা।

সুখ, শান্তি, সান্ত্বনা কিছুই পায়নি দুখু। অনাথ আশ্রম থেকে সার্কাসের আওতায় পা দিয়ে। মানতে চেষ্টা করছে সে রিং-

মাস্টারের হুকুম। শিখতে চেষ্টা করছে দুখু সার্কাসের খেল্‌-কসরত। পেরে উঠছে না কিছুতেই।

সেদিন সকালে রিং-মাস্টার নিজেই দুখুকে শেখাতে চেষ্টা করছিলেন জিমনাস্টিকের কয়েকটা কসরত। দুখু কিছুতেই পারছে না দেখে চিৎকার করে উঠলেন—"তূম্‌ একটা আস্ত বাঁন্দর আছে।"

দুখু তখনও মাটিতে মাথা রেখে, পাগুলো ওপরে তোলবার জন্যে বার বার ছুঁড়ছে। কিছুতেই পা দুটো খাড়া হচ্ছে না। বার বার সে পড়ে যাচ্ছে ডিগবাজি খেয়ে। রিং-মাস্টার পটাপট চাবুকের শব্দ করছে। দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠলো—"হতভাগা বাঁন্দর আছে তুমি! সাতদিনমে ডিগবজি ছাড়া আর কুছু না শিখতে পারলে ?"

মাটিতে মাথা রেখে, ঠ্যাঙ দুটো ওপরে ছুড়তে ছুড়তে দুখু হয়রান হয়ে পড়েছে। কষ্টে কাতরাতে কাতরাতে বললে—"বড্ড শক্ত সাহেব! পারছি না আমি।"

"হুম! কৌন কাজটা পারবে তুমি, কৌনটা সহজ হোবে, শুনি ? গর্জে উঠলো রিং-মাস্টার।

"ক্লাউনের কাজ দাও হুজুর দয়া করে।" দুখু বললে বেপরোয়া হয়ে।

"বেশ বেশ! তাই হোবে। হামি তুমাকে ট্রায়াল দেবে। না পারলে বহুত সাজা হবে।" বলে দুখুর পাছায় থাবড়া দিয়ে উঠিয়ে দিলে। বাঁচলো দুখু হাঁপ ছেড়ে।

আদালতের কাঠগড়ায় হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো পাঁড়েজী। বিচার তার শেষ হলো। হাকিম সাহেব রায় দিলেন—"সাক্ষী-প্রমাণের

অভাবে শ্রীরাম পাণ্ডের অপরাধ প্রমাণিত হয়নি। আমি তাকে নির্দোষ বলেই সব অভিযোগ থেকে মুক্তি দিলাম।"

হাকিম সাহেবের রায় শুনে—পাঁড়েজী আপন মনেই বলে উঠলো—"হে ভগবান, তুম্‌হী বচানেওয়ালা।" হাত দুটো জোড়া করে—কপালে ঠেকালো। চোখের জল গড়িয়ে পড়লো পাঁড়েজীর দু'গাল বেয়ে। পাহারাওয়ালা আদালতের কাঠগড়ার দরজা খুলে দিলে। ছাড়া পেয়ে, জেলখানায় গিয়ে তার পোঁটলা-পুঁটলী বুঝে নিলে। ছুটলো সে গঙ্গার ঘাটে। চুল-দাড়ি ছেঁটে সে কয়েদীর সাজ বদলালে। প্রায়শ্চিত্ত করে সাজলে আবার সেই রাজবাড়ীর ঠাকুর। আগেকার সেই টিকিওলা পাঁড়েজী। কিন্তু কোথায় তার স্নেহের দুলালী লখু। তার স্বপ্নমাখানো ছোট্ট রাজকন্যে! কোথায় সে রয়েছে? কার ঘরে? কী সাজে!

সার্কাসের সাজ-ঘরে। বড় ক্লাউন টম-টম সাহেব সাজ বদল শুরু করেছে। ভারী মজার সাজে সাজছে সে আজ। পুরু ঠোঁটের ওপর আধখানা গোঁফ তৈরি করেছে কালো রঙের ঝুটো ক্রেপ দিয়ে, বাকি আধখানা গোঁফ তৈরি হচ্ছে সাদা ক্রেপ লাগিয়ে।

বড় ক্লাউন টম-টম সাহেব, দুখুর মুখেও কালি-ঝুলি মাখিয়ে দিয়েছে। ক্লাউন সাজবে দুখুও আজ। ভাঁড়ামীর খেলা দেখিয়ে রিং-মাস্টারকে সে খুশি করে দেবে। এই আনন্দেই সে মত্ত। বড় একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে আরও রকমারি রং লাগাচ্ছিল। রং লাগাতে লাগাতে দুখু বললে—"টম-টম সাহেব আমার দুটো গোঁফ চাই।"

বড় ক্লাউন টম-টম সাহেব সাজতে সাজতে ঘাড় ঘুরিয়ে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলে—"ডুটা গোঁফ! কেনো?"

দুখু আসল কথাটাই বলতে যাচ্ছিল। ঝট করে নিজেকে সামলে নিয়ে আমতা আমতা করে জবাব দিলে—"একটা আমার নিজের জন্যে—আর একটা আমার·········কপালের জন্য।"

টম-টম সাহেব হো—হো করে হেসে উঠলো। দুখুর দিকে রকমারী নকল গোঁফ-ভর্তি একটা ছোট্ট বাক্স ঠেলে দিয়ে বললে—"লে! যতটা খুশি গোঁফ লাগিয়ে লে কোপালে, গালে। হামি খেল্ দেখাতে যাচ্ছে। টুমভি ডশ মিনিট মে রেডি হো যাও।"

বড় ক্লাউন টম-টম সাহেব, সার্কাসের ঘণ্টা শুনেই সাজঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

অতরকমের অতগুলো নকল গোঁফ একসঙ্গে পেয়ে দুখু আঁকপাকু। আনন্দে দিশেহারা। এক এক রকমের একটা করে গোঁফ তুলে নিয়ে ঠোঁটের ওপর ধরে, আর আয়নাতে নিজের অদ্ভুত চেহারা দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ে। এমনি করতে করতে যে দুটো গোঁফ তার খুব পছন্দ হলো, সে দুটো গোঁফ লুকিয়ে ফেললে ঝট করে তার প্যাণ্টের পকেটে।

হঠাৎ আয়নাতে ছায়া পড়ল চন্দ্রলেখার। ঘোড়ার ওপর পরী সেজে যে খেলা দেখায়, সেই মেয়েটি। দুখুর সঙ্গে ক'দিনেই তার খুব ভাব হয়ে গেছে। দুখুকে সে 'ভাইয়া' বলে ডাকে, দুখু তাকে বলে 'দিদিজী'!

পেছন থেকে পা টিপে টিপে এসে চাপা গলায় বললে—"ভাইয়া, তুমি ক্লাউনকে খেল্ খেলতে যাবে না। ও বহুৎ নোংরা কাজ আছে।"

দুখু চোখ ফিরিয়ে তাকালো 'দিদিজী' চন্দ্রলেখার মুখের দিকে। দেখে, দিদিজীর চোখের কোলে জল। মুখে ভালবাসা মাখানো অনুরোধের আলো। দুখুও অবাক চোখে থতমতো খেয়ে প্রশ্ন করলো—"তাহলে! দিদিজী! আমায় তুমি কী করতে বলো?"

চন্দ্রলেখা দুখুর হাত দুটি ধরে কাতর অনুনয়ের সুরে বললে—"ভাইয়া! ভাগো য়ঁহাসে। এ জগাহ্ তুম য়্যাইসে অচ্ছে লড়কে কা লিয়ে নহী। তুমি পালাও ভাইয়া।"

দুখু কেমন ঘাবড়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞেস করলো—"দিদিজী, কেমন করে পালাবো। কোথা দিয়ে পালাবো?"

চন্দ্রলেখা দুখুকে কাছে টেনে নিয়ে তার মুখের রঙ, কালি মুছিয়ে দিতে দিতে বললে—"যেমুন করে আসলে—ঐহি রাস্তাসে ভাগবে।"

রঙ-কালি মুছিয়ে দিয়ে আরও কি যেন বললে চুপি চুপি দুখুর কানে মুখ রেখে। দুখুর মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

চন্দ্রলেখা জোর করে দুখুর হাত ধরে টেনে নিয়ে এগুলো। এদিক-ওদিক দেখে পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল সাজঘরের বাইরে।

পনেরো

গঙ্গার ঘাটে মাথা মুড়িয়ে, দাড়ি গোঁফ কামিয়ে মুখ মাথার বোঝা হাল্‌কা করেছে পাঁড়েজী। কিন্তু মনের ভার কমাতে পারে নি। উল্টে যেন মন আরও বেড়েছে ওজনে। সেই ওজন কমাতেই জনে জনে সে শুধোতে চায়, তার লখু—রাজার বেটি লখিয়ার খোঁজ মিলবে কোথায়! কাউকে কিন্তু জিজ্ঞেস করতে ভরসা হয় না।

আপন মনেই বিড় বিড় করে। বকতে বকতে পথ হাঁটে পাঁড়েজী। ইটপাথরের রাস্তা কথা কয় না, বোবা। কিন্তু কান খাড়া করে শোনে সক্কলের সব কথা। পাথরে গড়া পথের শক্ত মনেও দাগ কাটে পথ-চলা পথিকের ব্যথা।

পাঁড়েজীর কথাও রোড, লেন, বাইলেন সব রাস্তার কানে পৌঁছুচ্ছিল, ভেসে যাচ্ছিল হাওয়ায় হাওয়ায়। রাস্তারা শুনতে পাচ্ছে—"মেরে বাচ্চা, আঁখোকে সিতারে লখিয়া—তু কাঁহারে বেটিয়া! কাঁহা হ্যায় তুম?" দেখতে পাচ্ছে, এক বুলিই আউড়ে চলেছে পথ-চলা একটা মানুষ। মানুষ বটে, তবে ফানুসের মতোই ভাব-ভালবাসার হাওয়ায় ঠাসা। লোকটা হাঁটছে না, উড়ে চলেছে যেন।

মাঝে মাঝে যেতে যেতে থমকে থমকে দাঁড়াচ্ছে পাঁড়েজী। এধার ওধার চোখ ঘোরাচ্ছে, দাঁড়ে-বসা কাকাতুয়ার মতো। খুঁজছে যাকে, পাচ্ছে না তাকে। দেখতে পাচ্ছে না চেনা সেই সোনা-মুখখানা। অচেনা লোকদের মুখের দিকে ফ্যাল্‌ফেলে চোখ ফেলে, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করছে—"আপ কোই দেখা ইস্ রাস্তামে লখিয়াকে চল্‌নে?"

অচেনা লোকরা পথ চলতে চলতে কেউ চোখ ফেরায়—কেউ তার কথার জবাব দেয় না। একজন জিজ্ঞেস করলে—"এই! সে তোমার কে হয়? তোমার মেয়ে বুঝি?"

পাঁড়েজী লাফিয়ে ওঠে—"আরে রাম রাম! ও রাজার বেটি আছে। দেবী আছে।"

আশপাশের লোক চোখ ঠারাঠারি করে হেসে ওঠে। মন্তব্য করে—'পাগল!' 'মাথা খারাপ!' 'ন্যাকা!'

পাঁড়েজীর পায়ের তলার ইট-পাথরে গড়া রাস্তাটা চমকে ওঠে। মানুষগুলোর কথা শুনেই ভাবে—মানুষগুলো আমাদের চেয়ে ঢের বেশী শক্ত পাথর আর মসলা দিয়ে তৈরী।

রাস্তাগুলোর ঐ নিরেট ইট-পাথরে গড়া দেহের তলায় পথচলা পথিকদের হাসি-কান্নার প্রতিধ্বনি ওঠে। মানুষরা সেটা টের পায় না, তাই পথ চলতে চলতে বেসামাল কথা বলে। অশোভন আচরণ করে। রাস্তাগুলো সে-সব দেখে শুনে ক্ষণে ক্ষণে হাসে, কাঁদে, শিউরে উঠে। ভয়ও পায়, রগড় তামাসা দেখে মজাও উপভোগ করে।

আরও খানিক এগিয়ে, ছুটো গলির কাঁধ ডিঙ্গিয়ে—বড় চৌরাস্তাটার কান ঘেঁষে চওড়া ফুটপাথটা চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। তার বুকের ওপর মস্ত তামাসা জমে উঠেছে। ভিড় করে জুটেছে ছেলে-বুড়ো এক গাদা। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, ওরা দেখছে বাঁদর নাচের তামাসা। ওখানকার রাস্তাটাও তামাসার মজায় মজে গেছে। অদেখা চোখ দিয়ে দেখছে রাস্তাটাও তামাসা।

রঙ্‌চঙে ছিটের টুকরো দিয়ে জোড়া, তালিমারা মজাদার পোশাক বাঁদরটার গায়ে। মাথায় লাল টুক্‌টুকে টুপি। ছাগলের পিঠে চড়ে বাঁদর বর হয়েছে! শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে বউ আনতে। বাঁদর-নাচওয়ালাটা ডুগডুগি বাজিয়ে ছড়ার সুরে মজার গান ধরেছে। ছেলেরাও ডুগডুগির তালে তাল মিলিয়ে হাততালি দিচ্ছে।

ছেলেবুড়োর ভিড়ের মধ্যে দুখুও ঢুকে পড়েছে। তন্ময় হয়ে সেও দেখছে বাঁদর নাচ। তার গায়ের জামা কাপড় ময়লা হয়ে

গেছে। মুখখানা আরও ময়লা আরও শুক্‌নো। চোখছুটো শুধু জ্বলছে আশার স্বপ্নে জ্বলজ্বল ক'রে।

হঠাৎ পাঁড়েজীও পথ চলতে চলতে থমকে দাঁড়ালো। ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে সন্ধানী চোখে খুঁজছিল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে-গুলোর হাসিখুসি মুখগুলির মধ্যে তার চেনাজানা মুখটা।

চেনা মুখই চোখে পড়ল একটা। তবে সেটা লখুর নয় ছুখুর। খুশি হওয়ার বদলে ভয় পেয়ে শিউরে উঠলো পাঁড়েজী। ছুখু যদি ওকে দেখতে পায়, চিনতে পারে! চেঁচিয়ে উঠবে হয়তো "ছেলেধরা! ছেলেধরা!" বলে। অমন একটা মোকাবিলার ভয়েই পাঁড়েজী দাঁড়াতে ভরসা পেলে না। মুখ ঘুরিয়ে দৌড়ে পালালো সেখান থেকে।

বাকি লোকগুলোও পাছে পালায় অমন করে, তাই বাঁদর-ওয়ালা মাঝপথে নাচ থামিয়ে দিলে। ডুগডুগি বাজিয়ে হাত পাততে লাগলো সকলের কাছে। তামাসার মাশুল উশুল করার মতলবেই।

দর্শকরাও কম মতলবী নয়। পয়সা চাইতেই ভিড় ফরসা হতে শুরু করল। লোকজন সরে পড়তে লাগলো একটি ছু'টি করে। কেউ কেউ অবিশ্যি ছু' চারটে পয়সা, ডবল পয়সা, নয়া পয়সা ছুঁড়ে দিলে এদিক-ওদিক থেকে।

বাঁদরনাচ দেখে ছুখুর মনটাও নেচে উঠেছিল, নতুন আশায়। নতুন মতলবে। তাই সে ঝট্‌ করে তার ছেড়া ময়লা শার্টটার বুকপকেটে হাত ঢোকালে। পট্‌ করে একটা চক্‌চকে সিকি বার ক'রে ছুঁড়ে দিলে। চক্‌চকে সিকিটা কুড়িয়ে নিয়ে বাঁদরওয়ালা সেলাম করলে ছুখুকে। বললে—"খোকাবাবু রাজপুত্তুর বনবে।"

কথাটা শুনে দুখু মুখ নিচু করলে! নিজের ছেঁড়া ময়লা পোশাকের দিকে নজর যেতে লজ্জায় যেন কাটা গেল মাথাটা। সে আর দাঁড়াতে পারলে না সেখানে। মুখ কাঁচুমাচু করে সরে গেল। আড়ালে সরে গিয়ে নিজের মনেই নিজে বার বার বলতে লাগল,—'না! না! রাজার ছেলে আমি হবো না, হতে চাই না!'

পাঁড়েজী হনহনিয়ে পথ চলেছে। পাগলের মতো বার বার বলছে—"ভগবান, ও লড়কেকো রাজাকা বেটা বনাও। লখিয়াকো বনা দো রাজাকী বেটিয়া।" দুখু-লখু রাজপুত্তুর রাজকন্যে হোক, এই স্বপ্ন পাঁড়েজীর উদাস চোখে। স্নেহ-ভালবাসার অকূল কামনায় অন্তর তার তোলপাড়!

দুখুরও মন তোলপাড়। অসম্ভব কিছু চায় না সে হতে, অসম্ভব কিছু চায় না সে পেতে,—বাঁদরওয়ালাটাকে সেটা না জানিয়ে সে নড়তে পারে নি পথের আড়াল থেকে।

হঠাৎ দুখু দেখলে, বাঁদরওয়ালাটা খেলার আসর গুটিয়ে বাঁদর আর ছাগল নিয়ে উল্টো দিকে চলেছে ডুগডুগি বাজাতে বাজাতে। দুখু ছুটে গিয়ে তার পিছু নিলে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—"শুন্‌ছো! আমি রাজপুত্তুর হতে চাই না। আমি চাই বাঁদর, ছাগল, ডুগডুগি। চাই আমি বাঁদর-খেলাওয়ালা হ'তে।"

বাঁদরওয়ালাটা হাঁটতে হাঁটতে বিড়ি টানছিল। দুখুর কথা শুনে বিড়িটা মুখ থেকে নামালে। হাঁটতে হাঁটতেই জিজ্ঞেস করলে "সত্যি বল্‌ছো? বাপ-মা আছে?"

"না! খালি একলা পাগল ঠাকুরমা! আর ছোট্ট বোনটা আছে অনাথ-আশ্রমে। তাদের জন্যে রোজগার করতে চাই বাঁদরখেলা দেখিয়ে।" বললে দুখু সহজ সাহসেই।

"ভালো! ভালো! খুব ভালো কথা আছে। এ কারবারে লাগাবার পয়সা কুছু আছে?" জিজ্ঞেস করলে বাঁদরওয়ালাটা ঠোঁট বেঁকিয়ে।

তুখু বেশ গর্বভরে বুক পকেটটা চাপড়ে বললে—"হ্যাঁ, আছে।"

বাঁদরওয়ালাটা চাপাগলায় বললে—"বহুৎ অচ্ছা। থোড়া তফাৎ রেখে আসো আমার পিছে পিছে।"

তুখু যেন হাতে চাঁদ পেলে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো চললো বাঁদর-ওয়ালার পিছু পিছু। বেশ কিছুটা দূরে দূরে থেকেই।

ষোলো

শহরের দক্ষিণদিকে। লোক-বসতির মাঝখানে ছায়া-ঢাকা ছোট্ট একটা পার্ক। পার্কটা জেগে ওঠে রোজ সকালে বিকালে, কেঁপে ওঠে ওপাড়ার একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়ের ব্যায়াম আর নাচগানের দোলা খেয়ে। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে নাচ-গান খেলায় ভুলিয়ে রাখেন একটি মা। দেশকর্মী নরেন চৌধুরীর স্ত্রী মায়া দেবী। ভুলে থাকেন তাঁর খুঁজে-না-পাওয়া ছেলেটার তুঃখ, ঐ ছেলেমানুষী খেলাতেই।

সেদিন সকালেও মায়া দেবীর সেই ছেলেখেলাই চলেছে বেলা পর্যন্ত। ছোট ছোট প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটা পাড়ার ছেলেমেয়ে। রঙিন ফ্রক আর রকমারি জামা-কাপড়ের পাখনা-ডানা তুলিয়ে নাচছে গাইছে। যেন একদল ঝাঁকবাঁধা পাখি। মায়া দেবী দূরে বসে বাজাচ্ছেন মাউথ অর্গান। ছোটদের গলায় একতানের মিঠে গান!

পাখির গানের মতোই মিষ্টি। ওদের হাসি-কথা, চেঁচামেচি যেন চড়াই-শালিকের কিচিমিচি।

পাঁড়েজী পথ চলতে চলতে শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণে এসে পড়েছে। দূর থেকেই সে শুনতে পেয়েছিল ওদের চেঁচামেচি কিচিমিচি। পার্কটার কাছে এসে দেখতে পেলো—একসঙ্গে অনেক গুলো ছোট ছোট রাজকন্যে! খেলায় তারা মত্ত। কে জানে, ওদের দলে লখিয়াও হয়তো মিশিয়ে রয়েছে। আর কি পাঁড়েজী পথ চলে! পথভুলে ঢুকে গেল পার্কটার ভেতরে। নিরাশা ঘুচিয়ে নতুন আশায়, নতুন ভরসায়।

নতুন আশা-ভরসা বুকে নিয়ে দুখু চলে এসেছে অনেকটা পথ। শহর থেকে উত্তরের শহরতলিটায়। শহরের বড় রাস্তায় বাঁদর-খেলাওয়ালাটা দুখুকে কাছে ঘেঁষতে দেয় নি একদম। পাছে রাস্তার লোকের সন্দেহ জাগে। পাছে পুলিশ পাহারাওয়ালারা পিছনে লাগে। দূর থেকে দড়ির টানে সে তার বাঁদরটাকে নাচায় ইচ্ছে-খুশি মতো। তাই বোধহয় ইশারা-ইঙ্গিতে দুখুকেও সে নাচাতে পেরেছে। বাঁদর নাচাবার দুরন্ত স্বপ্ন দুখুর চোখে। তাই সে দেখতে বুঝতে পারলে না যে, সে নিজেই বাঁদর-নাচন নাচতে নাচতে চলেছে—বাঁদর-খেলাওয়ালাটার পিছু পিছু। বড় রাস্তা ছেড়ে, সোজা রাস্তা ছেড়ে, পা বাড়িয়েছে ছোট রাস্তায়। বাঁকা নোংরা রাস্তায়।

বাঁকাচোরা অলি-গলি পেরিয়ে, গয়লাপাড়ার খাটাল। ময়লা-দুর্গন্ধে নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসে। হড়হড়ে পিছল টালিপাতা খাটালটার আড়াল দিয়ে বাঁদরওয়ালাটার পিছন পিছন দুখু ঢুকলো

একটা বস্তির ভিতরে। তখনও দুখুর হুঁশ নেই, তার চারপাশের ছবিগুলো বদলে যাচ্ছে। আশপাশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। তার চোখ রয়েছে শুধু সেই বাঁদর আর ছাগলটার ওপরে। কান রয়েছে ডুগডুগির ডুগ্ ডুগ্ বাজনায়।

বস্তির ভেতরে ঢোকবার পর দু'-একজনের চোখ পড়েছে ফুট্‌ফুটে দুখুর দিকে। পুরু বাঁকা ঠোঁটগুলো তাদের নড়ে উঠেছে। বাঁদরওয়ালাটা চোখ ঠেরে তাদের মুখ বন্ধ করেছে।

একটা দড়ির খাটিয়ার ওপর বসে ঢোলক বাজিয়ে গান করছিল একদল লোক। ঢোলকের আওয়াজ আর গান দুখুর কান চমকালে, চোখ টানলে। দুখুর হুঁশ ফিরলো। মাথা ঘুরিয়ে দেখে, বড় বড় বাড়ি গাড়ি সব উবে গেছে! এসে পৌঁছেছে সে এক নতুন রাজ্যে!

এ-রাজ্যের লোকগুলোর সাজ-পোশাকই আলাদা। চেহারা-গুলোও কেমন কেমন। চাউনিগুলো যেন রীতিমত ভয়-পাওয়ানো। খাটিয়ার ওপর যে লোকগুলো বসে গান করছে, তাদের কারুর কারুর চেহারা মাদুর্গার অসুরের সঙ্গে খুব মেলে। ইয়া ইয়া গালপাট্টা, শোঁয়া পোকার মতো ভুরু, পাকানো গোঁফ। কারো ন্যাড়া মাথা, চুটকী দাড়ি! কারো মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল। চোখগুলো জবাফুলের মতো লাল। দুখুকে দেখে ওরা গান থামিয়েছে! আড়চোখে চাইছে, হাসছে!

ওদের রকম-সকম দেখে, এতক্ষণ পরে দুখুর বুকটা কেমন কেঁপে ওঠে। ছুটে গিয়ে বাঁদরওয়ালার হাত ধরল। বললে—"এখানে বাঁদর, ছাগল মিলবে কী করে?"

দুখুর কথা শুনতে পেয়ে খাটিয়ার ওপর থেকে একটা লোক বলে উঠলো—"বান্দর-বক্‌রী ভি মিলবে। বাঘ-ভালু ভি মিলবে।

ঘাবড়াও মৎ বেটা।” বাকি লোকগুলো হো-হো করে হেসে উঠলো। বাঁদরওয়ালাটা ডুখুর হাত ধরে বললে—“হাঁ! হাঁ ডরো মৎ। বেটা, ঘরমে চলো, খাও, খেলো।” এবার লোকগুলো মুখ টেপাটিপি করে হাসলো। ডুখুকে টেনে নিয়ে বাঁদরওয়ালা গলির বাঁকে মিলিয়ে গেল।

পার্কের ভেতরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোও মুখ টিপে হাসাহাসি করছিল। পাঁড়েজীর কাণ্ড দেখে। ন্যাড়ামাথা লম্বা টিকিওয়ালা পাঁড়েজী ওদের সামনেই বসেছে এসে ভুঁড়ি দুলিয়ে, মাথা নাড়িয়ে হাততালি দেওয়ার সে কী মজাদার ভঙ্গী! তার সেই রঙ্গ দেখেই ছেলেমেয়েগুলো হাসাহাসি করছে। মায়াদেবীরও চোখ পড়ছে লোকটার দিকে।

ক্লান্ত হয়ে মাটিতে পা-ছড়িয়ে বসেছেন মায়া দেবী। হাততালি দিয়ে তিনি তাল দিচ্ছিলেন ছেলেমেয়েদের নাচের সঙ্গে সঙ্গে। দূর থেকে উপভোগ করছিলেন পাঁড়েজীর অঙ্গভঙ্গী!

পার্কের বাইরের পাহারাওয়ালাটা পাঁড়েজীকে দেখতে পেয়ে রাস্তা থেকে ছুটে এলো। তার কাজই হচ্ছে সকাল বিকেল পার্কটা পাহারা দেওয়া। পার্কে যেসব ছেলেমেয়ে খেলতে আসে, তাদের আগ্‌লানো।

ছেলেধরা, গুণ্ডা বদমায়েসরা যাতে পার্কে পা না-গলায়, সে-দিকেও সে নজর রাখে। সেদিন নজরটা কেমন অন্যদিকে ছিল। সেই ফাঁকে পাঁড়েজী পার্কে ঢুকে পড়েছে। পাঁড়েজীর বেয়াড়া চেহারাটার দিকে চোখ পড়তেই সে তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছে। লোকটাকে তাড়াতেই।

পাহারাওয়ালা এসে পাঁড়েজীকে তাড়া লাগালো, বললে—"এই বদমাস্! এখানে কী জন্যে? ছেলেধরার মতলবে? ভাগো এখান থেকে।"

পাঁড়েজী চিৎকার করে উঠলো—"নেহি নেহি, হামি ছেলিয়া-ধরা না আছে।" বলে গ্যাঁট হয়ে বসে রইলো।

পাহারাওয়ালা রেগে গিয়ে পাঁড়েজীর হাত ধরল। চেঁচিয়ে বললে—"আলবৎ তুমি ছেলেধরা। নইলে এখানে ঢুকেছ কোন্ কর্মে?"

পাঁড়েজী হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠলো—"হামি ছেলেধরা না আছে।"

পাহারাওয়ালার সঙ্গে কথা কাটাকাটি কান্না চিৎকারেই ছেলেমেয়েগুলো টের পেয়েছে লোকটা ছেলেধরা। খেলা ফেলে তারা ছুটে পালিয়ে গেল। চেঁচাতে লাগলো "মাসীমা!—ছেলেধরা! ছেলেধরা!"

মায়া দেবীও ইঙ্গিত করলেন ছেলেমেয়েগুলিকে বাড়ি যেতে। তিনি এগিয়ে গেলেন পাঁড়েজী আর পাহারাওয়ালাটার দিকে। জিজ্ঞেস করলেন—"ব্যাপার কি পাহারাওয়ালা?"

পাহারাওয়ালা পাঁড়েজীকে টানতে টানতে জবাব দিলে—"ছেলেধরা মা! মতলব খারাপ।"

মায়া দেবী গম্ভীরভাবে বললেন—"নাওতো হতে পারে সেটা?"

পাঁড়েজী মায়া দেবীর পায়ে আছড়ে পড়লো—কাতর আবেদন জানালো—"না মাঈজী! হামি চোর, বদমাস, ছেলিয়াধরা না আছে, হামি ব্রাহ্মন। রসুইয়া ব্রাহ্মন। হামার ভি একঠো বাচ্চা ছিল, তারে হারাইলম। তার বদলাভি পাইলম একটা খোঁকী—

তাকে ভি হারাইলম মা। হামি হামার ওহি লখিয়াকে ঢোঁড়তে আছি মা, ভগবান সাক্ষী!"

পাঁড়েজীর কথায় মায়া দেবীর দু'চোখ জলে ভরে ওঠে। চোখের জল মুছে গম্ভীরভাবে বললেন—"ওকে তুমি ছেড়ে দাও পাহারাওয়ালা। ও যে কী তা আমি জানি।"

মায়া দেবীকেও ভাল করে চেনে জানে পাহারওয়ালাটা। তাই তাঁর হুকুমে সে ছেড়ে দিলে পাঁড়েজীকে।

মায়া দেবী পাঁড়েজীকে বললেন—"এসো তুমি আমার সঙ্গে।"

মায়া দেবী এগুলেন। পাঁড়েজীও চললো তাঁর পিছু পিছু।

নরেন চৌধুরীও স্বাগত জানালেন তাঁর বসবার ঘরে এক বৃদ্ধ অতিথিকে। বললেন—"আসুন, আসুন কাকাবাবু! ভারী খুশি হলুম।"

"আমিও কম খুশি নই বাবা! শুনলুম, তুমি এবার ভোটে দাঁড়াচ্ছ? নিশ্চই জিতবে। এবার হয়তো মায়া-মা'র দুখ্যু ঘুচবে, নিশ্চয়ই খুশি হবে মায়া?" চেয়ারে বসতে বসতে বললেন নরেন-বাবুর খুড়শ্বশুর, মায়া দেবীর কাকা গিরিজা চক্রবর্তী।

নরেন জবাব দিলে—"যতক্ষণ না আমি আমার মা আর ছেলেটিকে খুঁজে বার করতে পারছি—ততক্ষণ মায়ার কিছুতেই সুখ নেই কাকাবাবু।"

"তুমি এম-এল-এ হতে পারলে তাদের খুঁজে বার করাটা আরও সহজ হবে। মায়া কোথায়?" বললেন নরেন চৌধুরীর অতিথি ও আত্মীয় গিরিজাবাবু।

নরেন জবাব দিলে—"পার্কে গেছে পাড়ার ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে! এখুনি এসে পড়বে।"

পার্ক থেকে হেঁটে আসার পথে পাঁড়েজী সব কথা খুলে বলেছে মায়া দেবীকে। নাগ-সাহেবের বাড়িতে যা-যা ঘটতো। পরে যা-যা ঘটেছিল সব। মায়া দেবীও তাঁর ব্যথার সমব্যথী পেয়ে রীতিমত চঞ্চল ও উত্তেজিত হয়েছেন। বলে ফেললেন তিনিও পাঁড়েজীর কাছে নিজের দুঃখের কথা, একমাত্র ছেলে সুখরঞ্জনকে হারানোর ব্যথা।

পথ চলতে চলতে মায়া দেবী নিজের মনেই গুম্‌রে উঠে বললেন —"আমি ভেবে পাই না, ছ-ছটা ছেলেমেয়ের মা হয়েও এতটা নির্মম হয় কী করে মানুষ?"

"হোয় মা হোয়! জোয়াদা লড়কা-বাচ্ছা পয়দা হোলে মা, মা-কী মিজাজভি কড়া হোবে। আঁপনিতো বললেন—আপনার একঠো লড়কা, তারও ভি খোঁজ মিলছে না। তাই হাঁপনার এত্তো দয়া।" বললে পাঁড়েজী।

মায়া দেবী বললেন—"না! না! দয়া নয়! তুমিও যে আমার মতো দুঃখী। তাই সান্ত্বনা পাচ্ছি তোমার কথা শুনে। কিন্তু আমি কী ভাবে তোমাকে সাহায্য করবো সেটাইতো ভেবে পাচ্ছি না।"

পাঁড়েজী বললে—"ভাবনা কুছ নহী মাঈজী! হামারে আপনার বাড়ির দরওয়ান আর ঠাকুরের কামটা দিয়ে দিন।"

মায়া দেবী পৌঁছে গেলেন তাঁর বাড়ির দরজায়। ঘাড় নেড়ে বললেন—"বাবুকে বলবো। এসো তুমি বাড়ির ভেতরে।"

পাঁড়েজী ঢুকলো নরেন চৌধুরীর বাড়িতে।

সতেরো

বস্তির ভেতর বাঁদরনাচওয়ালার ডেরা। ঝড়ো কাকের মতো খড়োঢাকা চাল মাটির ঘর। চারধারে নোনা-ধরা, উঁচু কাদামাটির দেওয়াল-ঘেরা।

প্রায় দু' মাস হতে চললো দুখু ওখানে এসে ঢুকেছে। আর বেরুতে পারে নি। বাঁদরওয়ালাটা ওকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘরেই রেখে যায়। ভয় দেখায়, 'বাইরে গেলে পুলিশ পাহারাওয়ালা ধরে নিয়ে যাবে। বাঁদর-নাচানো শেখা হবে না।' সেই ভয়েই দুখু কোনও কথা বলে না। বাঁদর-নাচানো শেখবার আশায় সে লোকটা যা হুকুম করে তাই শোনে। রাঁধা-বাড়া, বাসন-মাজা, ছাগল-বাঁদরকে চান করানো সবই করিয়ে নেয় লোকটা, দুখুকে ভুলিয়ে ভালিয়ে। চিনেবাদাম, লজেন্স, বিস্কুট, ফুলুরি, তেলেভাজা কলাটা, পেয়ারাটা প্রায়ই এনে দেয় বাঁদরওয়ালা। তাতেই দুখু খুশি, তারই ভাগ দিয়ে দুখু বাঁদর আর ছাগলটাকেও খুশি করে। ভাব করে ফেলেছে জানোয়ার দুটোর সঙ্গে। ওদের মায়ার টানেই দুখু ভুলে আছে বাইরের জগতের টানটা।

বাঁদর-ছাগল নিয়ে যখন বাঁদরওয়ালাটা বাড়ির বাইরে চলে যায়, তখনই দুখুর মনটা হু-হু করে কেঁদে ওঠে। রাগও হয় বাঁদর-ওয়ালার ওপর। কিন্তু আবার ভয়ভাবনাও হয়। পালাতে গিয়ে যদি পাহারাওয়ালাদের হাতে পড়ে। চোর ডাকাতরা যদি ধরে! মনের সঙ্গে এমনি নানা ভাবনার লড়াই ঠোকাঠুকি চালায় আর দিন কাটায়।

সেদিন সকালে। মনের সঙ্গে অমনি লড়াই চালাতে চালাতেই হঠাৎ সে কেমন মরিয়া হয়ে উঠলো। উঠোনের এক পাশের ছোট্ট রান্না ঘরটাতে উনুন ধরাতে গিয়ে মনের মধ্যে আগুন ধরিয়ে বেরিয়ে এল।

ঘরটা থেকে পাকানো ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেরিয়ে আসছে। দুখুর মনের আগুনও ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে বাড়ছে, গুমরে-ওঠা রাগ আর চাপা কান্নায়। দুখু রান্নাঘরের দরজায় পা বাড়াতেই নজরে পড়লো—বাঁদরওয়ালাটা মুলোর মতো দাঁত বার করে হাসছে যেন বিচ্ছিরী মতলবের হাসি।

ঐ হাসি দেখেই দুখুর মনে ধুঁইয়ে-ওঠা চাপা আগুন দপ্ করে জ্বলে উঠলো। কেঁদে রেগে দুখু চেঁচিয়ে উঠলো—"আমি এখানে চাকরগিরী করবার জন্য আসি নি? উনুনধরানো, রান্না, বাসন-মাজা এসব আর করবো না।"

বাঁদরওয়ালাটা মিষ্টি করে শয়তানের হাসি হাসলো! আরও একছড়া কলা হাতে নিয়ে এগিয়ে এলো দুখুর দিকে। বললে—"খা বেটা কেলা খা, খেলা পিছে শিখবি।"

দুখুর চোখে অবিশ্বাস ও অভিমানের আগুন ধুঁইয়ে ওঠে। রাগে ফেটে উঠে, কলার ছড়াটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে সে। কান্নার হুঙ্কারে বলে উঠলো—"অনেক কলা খাইয়েছ তুমি এই দু মাস ধরে। আর চলবে না ওসব।" রাগে ফুটন্ত জল গড়িয়ে পড়লো দুখুর দু' গাল বেয়ে। মুখখানা হয়ে উঠলো তপ্ত খোলার মতো লাল।

বাঁদর-নাচওয়ালাটা গম্ভীরভাবে বললে—"চিল্লাস না, থাম।"

"না থামবো না। আমি চেঁচাবো, কাঁদবো।" বললে দুখু আরও রুখে উঠে।

বাঁদরওয়ালাটা চোখ পাকিয়ে এগুলো, বেশ ধীরে সুস্থে ডান-হাতটা তুলিয়ে দুখুর গালে একটা চড় কসালো। তারপর দুখুর হাতটা চেপে ধরে ঐ কচি মুখে মারলে পর পর আরও তিনটে ঘুষি।

দুখু টের পেল, মাথা ঘুরছে। মুখের ভেতর রক্তের ঢেউ খেলছে। আরও একটা ঘুষি। দুখু ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো রান্নাঘরের ভেতরে। বাঁদরনাচওয়ালাটা ঝট্ করে চৌকাঠের শেকলটা তুলে দিল। বাইরে থেকে চোখ পাকিয়ে, দাঁত খিঁচিয়ে ধমকে বললে—"ভাল চাস্‌তো মিজাজ ঠাণ্ডা ক'রে খানা পাকিয়ে রাখ, হামি গোসল করে আসবার আগে।"

রাগে গজরাতে গজরাতে দড়ি-বাঁধা ভাঙা বোতলটা থেকে দু' খাবলা তেল ঢেলে নিলে বাঁদরওয়ালাটা। মাথায় তেল রগড়াতে রগড়াতে টেনে নিলে তার ময়লা জামা-কাপড়, লুঙ্গি। এক টুকরো সাবান আর তেলচিটে গামছাখানা। বেরিয়ে গেল গাল দিতে দিতে।

বাঁদরটা মেঝেতে ছড়িয়ে-পড়া কলাগুলো খেতে খেতে নাচতে লাগলো, রগড় দেখে।

দুখুকে মারধোর করে ঘরে পুরে রেখে বাঁদরওয়ালা নিশ্চিন্ত। সাবান কাচতে বসেছে সে বস্তির পচা-পুকুরটার ঘাটে। ঘাটের ভাঙা পৈঁঠের রানার ওপর কাপড়চোপড়গুলো কাচছে থুপে থুপে, সাবান মাখিয়ে নিয়ে। মনটাকে হাল্কা করার জন্যে গুন গুন করে গাইছে একটা চুটকী গান। রোজদিনের মতোই আজও সে চান সেরে বাড়ি গিয়েই খানা পাবে। তাই দিব্যি খোশমেজাজে গান

গেয়ে কাপড় কাচছে। দোস্ত-ইয়াররা চান করতে আসছে। বিড়ি টানতে টানতে তাদের সঙ্গে ঠাট্টা মস্করাও করছে।

দুখু মার খেয়ে অজ্ঞান হয়েই পড়ে গেছলো। জ্ঞান হবার পর সে টের পেলে—রান্নাঘরের দরজা বন্ধ! বাইরে থেকে শেকল তোলা। তাকে বন্দী করে রেখে গেছে বাঁদরনাচওয়ালাটা। বেচারা দরজায় ধাক্কা মেরে মেরে হয়রান! ভেতর থেকে কাঁদতে শুরু করেছে তাই।

বাইরে থেকে, দরজায় কান রেখে মাথা চুলকিয়ে বাঁদরটা কি যেন ভাবলে। দু' চারবার এদিক-ওদিক দেখেই দরজার শেকলটা খুলে দিলে। দুখু দরজা খুলে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এলো। গালে তার কালশিরে পড়ে গেছে। শরীরটা ভয়ে কাঠ! জলভরা চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগলো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে! হঠাৎ দুখু দেখে, বাঁদরটা লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে তার হাত ধরে টানছে। ইশারা করছে পালিয়ে যেতে!

বাঁদরটার ইশারাতেই দুখুর ভরসা বাড়ে। চট করে দড়ি থেকে তার সার্টটা টেনে নিয়েই, চটিটা পায়ে গলিয়ে বাঁদরটার পিছু নিলে। বাঁদরটাই দুখুকে বস্তির ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। দিয়ে এলো বড় রাস্তার কাছাকাছি। দুখু ভাবতে লাগলো—বাঁদরটার কী বুদ্ধি!

খানিক বাদে চান সেরে নিজের কাপড়-চোপড় কেচে নিয়ে বাঁদরনাচওয়ালাটা ঘরে ফিরলো। ডেরায় ঢুকে দেখলে রান্নাঘরের দরজার চৌকাঠে শেকলটা ঠিকমতো লাগানো আছে। দরজার

সামনে বসে বাঁদরটা। চারধারে কলার খোসা ছড়িয়ে, দিব্যি সে কলা চিবুচ্ছে।

বাঁদরনাচওয়ালা উঠোনের দড়িতে কাপড়-চোপড় মেলে দিতে দিতে খোশমেজাজে জিজ্ঞেস করলে—"আরে দুখুয়া, খানা বন্‌লো? খানা দে।"

রান্নাঘরের ভেতর থেকে কেউ কোনও সাড়াশব্দ দিলে না। আর একবার হাঁক পাড়লে সে—"দুখুয়ারে, দুখুয়া!" কোনও জবাব নেই! নিজেই সে এগিয়ে গেল রান্নাঘরের দিকে। দরজার শেকলটা খুলে দরজাজোড়া ঠেলে দেখে—রান্নাঘর খালি। দুখু নেই সেখানে!

দুখুকে দেখতে না পেয়ে রাগে জ্বলে উঠল লোকটা। বুঝলে, সবই বাঁদরটার কারসাজি। লাফিয়ে ধরতে গেল বাঁদরটাকে। পা পড়লো চারধার ছড়ানো কলার খোসায়। সঙ্গে সঙ্গে একেবারে চিৎপাত। বাঁদরটা লাফ মেরে উঠে পড়েছে তখন কাদামাটির দেওয়ালটার ওপরে।

আঠারো

শহরে ভোটযুদ্ধের তোড়জোড় চলেছে। দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার। অলিতে গলিতে সভা, রাস্তায় শোভাযাত্রা, হল্লার মাত্রাটা রীতিমত বেড়েছে।

ছোট বড়ো ছেলেমেয়ে-বোঝাই একটা মস্ত লরী। শহরের বড় রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে। লরীটার আষ্টেপৃষ্ঠে লাল নীল রংয়ের বড় বড় হরফে ছাপা, হাতেলেখা পোস্টার লাগানো।

হরফগুলো জাহির করছে "নরেন চৌধুরীকে ভোট দিন।" "আপনার ভোট নরেন চৌধুরীকে দিতে ভুলবেন না।"

লরীর যাত্রী ছেলেমেয়ের দলও নিশান উড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে জানাচ্ছে ঐ একই অনুরোধ—"নরেন চৌধুরীকে ভোট দিন।" কখনও বা একজন বলছে—"ভোট দেবেন কাকে ?" অন্য সবাই চেঁচাচ্ছে—"নরেন চৌধুরীকে।"

ছেলেমেয়েদের চিৎকারে সারা রাস্তা কাঁপিয়ে লরীটা দৌড়চ্ছে।

দুখুর কানে অতো চিৎকারের কিছুই ঢোকে নি। বস্তি থেকে পালিয়ে, বড় রাস্তায় পা-দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় ভাবনা ঢুকেছে—কোথায় সে যাবে! কী করবে সে এর পর! ভাবতে ভাবতেই আনমনা দুখু।

আনমনা হয়েই রাস্তাটা পার হচ্ছিল দুখু। পড়লো গিয়ে ভোটের ঐ লরীটার সামনে। ভাগ্যিস! লরীর ড্রাইভার ঘ্যাঁচ করে ব্রেকটা কষে দিল। ক্যাঁচ করে গাড়িটা থেমে গেল। বেঁচে গেল দুখু একটুর জন্যে। হেঁচকা খেয়ে লরীটা থমকে থেমেছে। লরীর ওপরকার ছেলেমেয়েগুলো হুড়মুড়িয়ে গড়িয়ে পড়লো একটা আর একটার ঘাড়ে। দুখুও হকচকিয়ে গেছে। থমকে গিয়ে কাঠের পুতুলের মতো সে দাঁড়িয়ে পড়লো।

ড্রাইভারের পাশেই বসে ছিলেন বুকে ব্যাজ লাগানো এক ভলান্টিয়ার। তিনি আঙুল নেড়ে ইশারা করে দুখুকে তাঁর কাছে ডাকলেন।

ততক্ষণে দুখু নিজেকে সামলে নিয়েছে কিছুটা। গটগট করে এগিয়ে গেল সে লোকটির সামনে। লোকটি জিজ্ঞেস করলে—"যাবে নাকি হে এদের সঙ্গে ?" বিরক্তি অভিমানে দুখুর ভুরু দুটো

কেঁপে উঠলো। গম্ভীরভাবে জবার দিলে—“মাপ করবেন। ঝুটমুট চেঁচিয়ে গলা ভাঙতে চাই না।”

লরীর ওপরকার ছেলেমেয়েগুলো ঝুঁকে পড়েছিল দুখুকে দেখবার জন্যে। দুখুর রকম-সকম দেখে, কথা শুনে, সবাই তারা হো-হো করে হেসে গড়িয়ে পড়লো।

ওদের দলের একটা বড় ছেলে ঝট করে বক দেখানোর ভঙ্গীতে দুখুর সামনে হাত বাড়িয়ে দিল। হাতে তার ডালমুট—লজেন্সের প্যাকেট। ভলান্টিয়ারবাবুর হাতে এক টাকার নতুন একটা করকরে নোট। ঠোঁট বেঁকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে রীতিমত ঠাট্টার সুরে তিনি বললেন—“লজেন্স, ডালমুট, সেই সঙ্গে এক একটা টাকা—ঝুটমুট কিসে? এসব পেলে তুমিও চেঁচাবে বন্ধু!” ঠাট্টা টিট্‌কিরীর ঠোক্কর খেয়ে দুখু ফোঁস করে ওঠে। “না! পুতুলনাচের পুতুল কিংবা কপচানো তোতা হওয়ার ইচ্ছে নেই আমার।” বলেই দুখু মুখ ঘুরিয়ে নিলে। দৌড়ে পার হলো রাস্তাটা। হন্‌হনিয়ে চলতে শুরু করলে, বুক ফুলিয়ে।

ভলান্টিয়ারবাবু লরীর ড্রাইভারের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললে—“চলো হে চলো। ছোঁড়াটার হেড আপিসে গোলমাল।”

লরী আবার গর্জে উঠে চলতে শুরু করলে। ছেলেমেয়েগুলো এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো—“ভোট ফর নরেন চৌধুরী।”

লখু নাগসাহেবের সঙ্গে বড় রাস্তার ফুটপাত ধরে হেঁটে চলেছে। অবাক হয়ে দেখছে—একটার পর একটা লরী-ভর্তি ছেলেমেয়েরা চলেছে। শুনছে, এক-এক দল বলছে এক-একজনকে ভোট দিতে। চেঁচাচ্ছে গলা ছেড়ে চোঙা মুখে দিয়ে।

এসব দেখে শুনে লখু চলতে চলতে ফট করে বলে বসলো—"আমি কিন্তু দাদাভাই ছাড়া কাউকে ভোট দেবো না!"

ক্যাম্প-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নাগসাহেব মুচকি হেসে ঘাড় নাড়লেন। বললেন—"ঠিক! ঠিক! আমি কিন্তু আমার ভোটটা তোকেই দেবো।"

"না! না! মামাবাবু, তুমিও দাদাভাইকে ভোট দেবে, আর সবাইকে বলবে দাদাভাইকে ভোট দিতে, এঁ্যা?" বললে লখু কোঁকড়ানো চুলে-ভরা ঝাঁকড়া মাথাটা নাড়িয়ে।

"বেশ কথা! তোর দাদাভাইকেই ভোট দেবো।" জবাব দিলেন নাগসাহেব একগাল হেসে!

লখুর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। হঠাৎ যেন তার ভাবনার রঙ্ বদলালো। লখু আনমনা হয়ে গেছে! সে ভাবছে, দাদাভাই কোথায়! দাদাভাইকে কাছে না পেলে নাগসাহেব ভোটটা কী করে দেবেন তাকে!

লখুর ছোট্ট মাথায় ভাবনার কোনও জবাব মেলে না। তাই সে আঙুল কামড়াতে কামড়াতে জিজ্ঞেস করলে—"বারে! কী করে ভোট দেবে? দাদাভাইকে খুঁজে বার করতে না পারলে?"

"খুঁজে তাকে বার করবোইরে বেটি। ঈশ্বর একটা ব্যবস্থা করবেন," বললেন নাগসাহেব লখুর হাতে নরম একটা ঝাঁকুনি দিয়ে।

খুশির আমেজে আবার লখুর কালো মুখটা আলো হয়ে উঠলো। একগাল হেসে জিজ্ঞেস করলো সে—"ঈশ্বর কোথায় থাকে মামাবাবু? ঈশ্বরের বাড়ি চেনো? ঠিকানা জানো?"

নাগসাহেব ঠোঁটে হাসি মাখিয়ে ঘাড় নাড়লেন। আনন্দের

চোটে লখুর পা দুটো নেচে উঠলো। জোরে জোরে পা-চালিয়ে এগিয়ে চললো, ওরা দু'জনেই। চৌরাস্তার মোড় ঘুরে ওরা বাঁকের মাথায় মিলিয়ে গেল।

রাস্তা চলতে চলতে দুখুও এসে পড়েছে শহরের সবচেয়ে ব্যস্ত আর বড় রাস্তাটায়। ছোট-বড়ো গাড়ি-বারান্দার ছায়া-ঢাকা ফুটপাথ ধরে চলেছে দুখু।

রকমারী জিনিসের দোকান-পাট, হোটেল, রেস্তোরাঁ, ফুট-পাথের গা ঘেঁষে। সাহেব-মেম, রকমারি জাতের মানুষ, রকমারি পোশাকে সেজেগুজে চলেছে। সবাই তারা ব্যস্ত! খট্-খট্, গট্-গট্ হনহনিয়ে চলেছে। কেউ কারুর দিকে ফিরে তাকায় না। দুখু কিন্তু সবদিকে তাকিয়ে সবকিছু দেখছে।

রঙ্‌চঙে জিনিস, আর বেসাতিতে সাজানো দোকানগুলো, ঠিক ছবির মতো। চোখ জুড়োয়, মন ভরায়। ভিড়ের ফাঁক গলে দোকান পসার দেখতে দেখতে দুখু সব ভাবনাই ভুলে গেল। হঠাৎ তার চোখ পড়লো মস্ত একটা দোকানের দিকে। বড় বড় কাঁচের জানলাগুলোর ভেতরে। কাঁচের জানলার আড়ালে, রঙ্‌চঙে কতরকম জামাজুতো, পুতুল, খেলনা সাজানো।

দুখুর আর চোখ নড়ে না। পা সরে না। দুখু দাঁড়িয়ে পড়লো। দোকানটার একটা বড় জানলার সামনে তার বড় বড় চোখ দুটোর দরজা খুলে দিলে। একদৃষ্টে তন্ন তন্ন করে দেখতে লাগলো সওদা-গুলো। প্রত্যেকটি জিনিসের গায়ে সাদা টিকিট ঝোলানো। গোটা গোটা লাল অক্ষরে ছাপা SALE কথাটির নীচে প্রতিটি জিনিসের দাম লেখা।

দামগুলো দেখতে দেখতে দুখুর চোখ ঠিকরে পড়লো, ঠিক লখুর মতো বড় একটা পুতুলের গায়ে হোঁচট খেয়ে। পুতুলটা ভারী সুন্দর, ঠিক যেন জ্যান্ত! তার গায়ে পরানো সাদা ফুলটার ওপর টিকিট ঝোলানো। দাম লেখা রয়েছে মাত্র দু' টাকা।

দুখুর চোখ দুটো নেচে উঠলো খুশির ঝিকিমিকিতে। মনে হলো লখুর জন্যে দু'টাকা দিয়ে পুতুলটা কিনলে বেশ হয়। আনমনাভাবেই সে তার আঙ্গুল ক'টা ঢুকিয়ে দিলে বুক পকেটের ভেতর। বার করে আনলে একটা পুরনো খাম। খামটা খুলে দুখু তার ভেতরটা দেখেই চমকে উঠলো! কান্নাভেজা অবাক চোখে আপন মনে বলে উঠলো—"আমার টাকা তিনটে কে নিলে!"

চোখ মুছে খামের ভেতর থেকে একজোড়া নকল গোঁফ বার করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। মুখ থেকে বেরিয়ে এলো—"আমি চুরি করেছিলুম, তাই আমার টাকাও চোরে নিয়েছে।"

ঠিক সেই মুহূর্তে লখু পেছন থেকে পা টিপে টিপে এসে দুখুর কোমরটা খপ করে জড়িয়ে ধরল। লখুকে ওখানে অমন করে দেখতে পেয়ে দুখু শিউরে উঠলো। —"লখু তুই! কী করে এখানে এলি?"

একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন নাগসাহেব। তাঁর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে লখু খিলখিল করে হেসে উঠলো। হাসির ঢেউ তুলে বললে—"মামাবাবুকে ঠিকানা বলে দিয়েছে ঈশ্বরবাবু।"

নাগসাহেবকে সামনে দেখে দুখু হতভম্ব। মুখ দিয়ে তার কথা বেরোয় না। চোখ তুলে সে চাইতে পারে না।

নাগসাহেবই এগিয়ে এলেন। দুখুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন—"হাঁ বাবা! ঈশ্বরেরই দয়া।"

লজ্জা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দুখু নুয়ে পড়ে নাগসাহেবের পায়ের ধূলো নিলে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না-চাপা কণ্ঠে সে বললে—"আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। সত্যি সত্যি আমি পালাতে চাই নি, আমি গেছলাম শুধ্……"

"হ্যাঁ! ওতো গেছলো গোঁফ কিনতে। বলি নি মামাবাবু?" লখুই শেষ করলে দুখুর না-বলা কথাটা।

"জানি বাবা জানি।" বলে ক্যাম্প-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নাগসাহেব হেসে দুখুর হাত ধরলেন। দু'হাতে দুটি ভাইবোনের হাত ধরে ঐ বড় দোকানটার দরজার দিকেই এগিয়ে চললেন।

দুখুর সাহস-ভরসা ফিরে এলো। চোখ মুছে জিজ্ঞেস করলে—"ঠাকুরমা কেমন আছে স্যার?"

"একদম ভালোরে দাদা! আমাদের নতুন বাড়িতে চলে গেছে ঠাকুরমা!" চোখ নাচিয়ে জবাব দিলে লখু।

দুখু অবাক চোখে তাকালো লখুর দিকে। লখু ঘাড় দুলিয়ে চোখ বেঁকিয়ে বললে—"ভাবছিস কী, আমাদেরও নতুন জামা-জুতো হবে। নতুন জামাজুতো পরে আমরাও একদম নতুন হয়ে আমাদের নতুন বাড়িতে যাবো। তাই না মামাবাবু?"

নাগসাহেব ঘাড় নেড়ে লখুর কথায় সায় দিলেন। বললেন—"ঠিক তাই! এবার একেবারে নতুন জীবন।"

ওরা তিনজনেই সেই বড় দোকানটার ভেতরে ঢুকে গেল।

উনিশ

নতুন জীবন, নতুন আশার সাড়া পড়ে গেছে উদ্বাস্তু ছাউনিতে। হঠাৎ যেন জেগে উঠেছে, ঝিমিয়ে পড়া বাসিন্দারা! নড়ে উঠেছে ভাঙা, জীর্ণ তাঁবুগুলো। উৎসাহের জোয়ার এসেছে। নিরাশায় ভেঙ্গেপড়া মন-নদীর ঘাটে ঘাটে।

তাঁবুর সংসার উঠিয়ে ওরা দলবেঁধে চলে যাচ্ছে। মাইল কয়েক দূরে, নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছে উদ্বাস্তুনগর। নতুন নতুন পাকা বাড়ি। ওরাই সেসব ঘরবাড়ির মালিক হবে। সেখানেই এবার পাকাপাকিভাবে ঠাঁই পাবে। কাজ পাবে, ছেলে বুড়ো সবাই ব্যস্ত তাই।

কেউ মোটগাঁট্রি বাঁধছে। গরুর গাড়ি, ঠেলা-গাড়িতেও মাল বোঝাই করছে কেউ কেউ। যাদের গোছগাছের কাজ সারা, তারা আগেই রওনা হয়েছে। হাঁটতে শুরু করেছে। মস্ত ময়াল সাপের মতো এঁকে বেঁকে চলেছে লোকের সারি।

ছেলেমেয়ের দলকে সামনে রেখে লাইন করে এগিয়ে চলেছে একদল মেয়ে-পুরুষ। লাঠিসোঁটা, খুঁটি খোঁটা, কোদাল খোন্তা কাঁধে নিয়ে চলেছে তারাই। তালে তালে পা ফেলে। হেলে-দুলে গান গেয়ে।

গানটা ওরা নিজেরাই বেঁধেছে—"নতুন জীবন, নতুন আশা—নতুন ঘরে বাঁধব বাসা।..." ওরা এগিয়ে চলছিল দিব্যি আনন্দে। বাঁধন-খোলা জল-স্রোতের মতোই ঢেউয়ের কল্‌কল্‌ ছন্দে।

হঠাৎ ছন্দ-পতন ঘটলো। উল্টো দিক থেকে, তেড়ে আসা একটা জীপ-গাড়ীর বিকট শব্দ আর শিঙার চিৎকারে। ছ'সাতটা ভুঁড়িদাস লোক গাড়িটার সওয়ার। ঘড়ঘড়িয়ে ফোঁসফুসিয়ে জীপটা এসে দাঁড়ালো, ওদের পথ আগলে। তাল ফেলে চলা আর গানভরা গলা থমকে থেমে গেল।

জীপ-গাড়িতে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের দলের নেতা গলা বাড়িয়ে বক্তৃতার ঢঙে বললেন—"অহো কমরেড্‌গণ, আপনারা এমন ক্ষেপলেন কেন? জানেন কি আপনারা এই নতুন জীবন আর নতুন উদ্বাস্তু নগরীর লোভে পড়ে ছুট্‌লে আপনাদের কপালে কী জুটবে?"

ভিড়ের ভেতর থেকে জনকয়েক একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে—"কী জুটবে, শুনি?"

সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাটি মুঠো ঝাঁকিয়ে, চোখ পাকিয়ে জবাব দিলে—"হাড়ভাঙা খাটুনি, সভা শোভাযাত্রা বন্ধ। মেয়ে-পুরুষ কাচ্চাবাচ্চা সকলকেই খেটে খেতে হবে। রোজগার করতে হবে। খয়রাতী সাহায্য আর মিলবে না।"

কতকগুলি লোক বেশিরভাগই বুড়ো আর বাচ্চার দল, চেঁচিয়ে জবাব দিলে—"সেডা খারাপ অইব কিসে?"

একদল জোয়ান ছেলে ক্ষেপে উঠে বললে—"খয়রাতি ডোল দিতেই অইব—সরকার দেশ ভাগ কর্‌ছে ক্যান?"

আর একদল জোয়ান ছেলে প্রতিবাদ জানালে—"তোমাগোর গলায় দড়ি। লজ্জা লাগে না?" ব্যাস আর কোথা যাবে। আপনা থেকেই ছোট খাটো হাতাহাতি, কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল নিজেদের মধ্যে। তবে যারা ঐ উদ্বাস্তু নেতাদের স্বরূপটি চিনে

ফেলেছিল, তারা সেসব দিকে চোখ কান দিলে না। গান গেয়ে এগিয়ে চললো সব উস্কানি অগ্রাহ্য করে।

দুখুদের তাঁবুটার ভেতর দুখুর ঠাকুরমা তখনও ব্যস্ত। জিনিস-পত্তর গুছিয়ে নিতে বুড়ি হিম্‌সিম্। লখু-দুখু তো কাছে নেই। একলাই বুড়ি এটা আনছে সেটা টানছে। মরচেপড়া কতকগুলো টিন, ভাঙা ঝুড়ি, নড়বড়ে সেই চরখাটা টুকিটাকি এটা সেটা। সবই বুড়ি গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখছিল, বাঁধছিল। হঠাৎ বুড়ির নজর পড়লো তাঁবুর কোণে একথাক ইঁটের ওপর। দুখু-লখুর পড়ার বইগুলো সেখানে জড়ো করা। ছুটে গিয়ে বইগুলো বুড়ি বুকে তুলে নিলে।

নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে বুড়ি,—"লখু দুখু যদি ইস্কুলেই পরতে আছে, হেইলে তাগো বই গুলান্ এখানে ক্যান?" আপন মনে পরক্ষণেই বলে ওঠে—"হারে আমার বুদ্ধি! অখন তো তারা ভিন্ন বই পরতে আছে।" তবুও বইগুলোর ওপর চোখের আদর বুলিয়ে—বেঁধে-রাখা পুঁটুলিটার ভেতরে সযত্নে গুঁজে রাখে।

বুড়ি তবু আনচান্। কী যেন একটা জিনিসের খোঁজে গোছানো জিনিসগুলো বারবার নাড়াচাড়া করছে। এটা হাঁটকাচ্ছে, সেটা হাঁটকাচ্ছে। শেষমেশ সেই মূল্যবান জিনিসটার হদিস মিললো। কোথা থেকে বুড়ি খুঁজে পেতে বার করে আনলে কাঠের তৈরী লক্ষ্মীর গাছ-কৌটোটা। বার বার সেটাকে কপালে ঠেকিয়ে বিড় বিড় করে বলে উঠলো—"মা-লক্ষ্মীর দান, আমার লুকানো ধন।"

ঠিক তেমন সময়। বাইরে থেকে কাঁপানো গলায় কে যেন হাঁক দিলে—"অরে অ দিদি, বলি অ দুখুর ঠাকুরমা—অখনও তোমার কাম সারতে পার নাই?"

বাইরের ঐ হাঁক শুনে, দুখুর ঠাকুরমা ব্যস্ত হয়ে তড়বড়িয়ে পুঁটলিটা টানতে টানতে বললে—"হ! হ! কাম সারা। যাইতে আছি।" পোটলাটা তুলে নিয়ে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এল বুড়ি।

তাঁবুর বাইরে এসে বুড়ি দেখে তাজ্জব ব্যাপার। আক্কেল গুড় ম! হেসে বুড়ি গড়াগড়ি।

হাড় জিরজিরে কঙ্কালসার আর এক খেঁকুরে বুড়ি। ঘর-সংসারের তামাম জিনিসপত্তর, মায় একজোড়া মুরগী আর একটা পাঁঠার ছানা সঙ্গে নিয়ে ঝাঁকামুটের ঝাঁকায় চেপে হাজির। তার ঐ কাণ্ড দেখে দুখুর ঠাকুরমার হাসি আর থামে না।

ঝাঁকার ওপর থেকে খেঁকুঁরে বুড়িটা তাই খেঁকিয়ে উঠলো। বললে—"হাসনের কিছু নাই! নতুন জীবন, নতুন ঘর পাবা? নতুন যান-বাহনে যাবা নাই বা ক্যান নতুন শহরে? কষ্ট যদি করবার না চাও তো চড়বার পারো ঝাঁকার ভিতরে।"

দুখুর ঠাকুরমা কোনও রকমে হাসি চেপে বললে—"না দিদি! আপনে যান আমি হাইটাই যামু।"

নতুন জামাজুতো সাজপোশাকে সেজেছে দুখু-লখু। কতক-গুলো বাক্স পোঁটলা বগলাদাবা করে ওরা বেরিয়ে এলো। সেই বড় দোকানটা থেকে। নাগসাহেবের সঙ্গে।

নাগসাহেব হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন—"ট্রেন ছাড়তে দেরি নেই বেশি! ট্যাক্সিতে যাওয়াই ভালো, কি বল?"

লখু একেবারে আনন্দে লাফিয়ে উঠলো—"কী মজা! ট্যাক্সিতে আমি চড়ি নি কখ্খনও।"

দুখু চোখ পাকিয়ে তাকে শাসালে, অমন আ-দেখ্‌লে-পনার

করার জন্যে। লখুও লজ্জা পেলে, চোখ নামিয়ে জিভ ভেঙালে দুখুকে।

বেশি দূর এগুতে হলো না। সামনেই একটা বেবি ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল। পেছনের সীটে জামাজুতোর বাক্সপত্তর আর দুখু লখুকে তুলে দিয়ে, নাগসাহেব বসলেন গিয়ে পাঞ্জাবী ড্রাইভারটার পাশে।

ট্যাক্সি ছুটে চলেছে। পেছনের সীটে দুখু-লখুরও কথা চলেছে রকমারি ইশারা-ইঙ্গিতে। নাগসাহেব যাতে শুনতে বুঝতে না পারেন।

দুখু-লখু অত সাবধান হলে কি হবে! নাগসাহেব কিন্তু তাঁর ঠিক সামনে ঝোলানো গাড়ির ক্ষুদে আয়নাটাতে ওদের অঙ্গভঙ্গী সবই দেখতে পাচ্ছেন, আর মনে মনে খুবই সেগুলো উপভোগ করছেন। দুখু-লখুর হুঁশ নেইকো সেদিকে।

লখু নাকের ডগাটা কুঁচকিয়ে হাত দিয়ে গোঁফপাকানোর ভঙ্গি করে ইশারাতেই জানতে চাইলে—"গোঁফ কী হলো? আনতে পেরেছিস।"

দুখু ঘাড় নেড়ে জানালে, "হ্যাঁ আনা হয়েছে।" সঙ্গে সঙ্গে চুপিসাড়ে ভেতরে-পরা পুরানো জামাটার বুক পকেটে হাত গলালে। খুব সাবধানে সেই নকল গোঁফভরা খামখানা বার করে এনে লখুকে চালান করে দিলে।

লখুও ভারী চালাক। আস্তে আস্তে খাম খুলে—নকল গোঁফ বার করে নাকের ডগায় আটকে তখুনি ভারিক্কী ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়তে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে নাকে নকল গোঁফের সুড়সুড়ি। আর অমনি হ্যাঁচ্চো করে পড়লো আচ্ছা জোরে এক হাঁচি।

দুখু বেচারা দু'হাতের চেটো দিয়ে নিজের ঠোঁট মুখ চেপে ধরে হাসিটা কোনও রকমে আটকালে।

নাগসাহেবও গাড়ির আয়নাতে ওদের দুটি ভাই-বোনের দুষ্টুমি আর রগড় দেখে ঠোঁট চেপে হাসছিলেন এতক্ষণ, কিন্তু আর বুঝি হাসি চাপা যায় না। হাসিটা চেপে তবু গম্ভীর গলায় বললেন—"জানিস লখু! এবার আমি খুব বড় বড় গোঁফ রাখবো।"

লখু-দুখু দুজনেই চমকে উঠলো। ঝট্ করে লখু নকল গোঁফটা পিছনে লুকিয়ে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ভাল মানুষটি। আব্দারের সুরে বললে—"না মামাবাবু! না! আপনি বড় গোঁফ রাখবেন না; আমাদের তা'হলে বড্ড ভয় করবে।"

নাগসাহেব হো-হো করে হেসে উঠলেন—"তোমাদের ভয় পাওয়াবে এমন কেউ জন্মায় নি। তোমরা একজোড়া বেপরোয়া দস্যি!"

গাড়ি এসে পৌঁছে গেল শহরের ইস্টিশানের সামনে। জিনিস-পত্তর গুছিয়ে নিয়ে ওরা সবাই নেমেই দৌড়লো।

কুড়ি

উদ্বাস্তুরা পৌঁছে গেছে নতুন উদ্বাস্তুনগরীতে। নতুন সংসার পেতেছে সবাই। ছোট ছোট নতুন বাড়িতে। সব বাড়িতেই উৎসবের ব্যস্ততা।

দুখুর ঠাকুরমাও ব্যস্ত লক্ষ্মী পূজোর আয়োজনে, নতুন বাড়িতে নতুন করে সংসার পেতে। পিটুলি গুলে দোরগোড়ায় আলপনা

দিতে দিতে বলছিলেন তিনি নাতি-নাতনীর কথা। ওঁদেরই প্রতিবেশী একটি মহিলার কাছে।

মহিলাটি দুখু-লখুকে ভাল করেই চেনেন। জানেনও তাদের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষার খবর কিছু কিছু। তাই ঠাকুরমার মুখে নাতি-নাতনীর কথা শুনে মন্তব্য করলেন—"সত্য কথা ঠান্‌দি, তোমার লখু-দুখু এক্কেবারে জোরা মানিক, খাটি দুইখান হীরার টুকরা।"

আলপনা দিতে দিতে বুড়ি আনমনাভাবে জবাব দিলে—"তার লাইগ্যাই তো ভাবনাটা বেশিরে দিদি! আমার দুখু লখু অখন ভালোয় ভালোয় ফেরতে পারলে বাচি।"

প্রতিবেশিনী মহিলাটি জবাব দিলেন—"নিশ্চয় ফিরবো, নাগ-সাহেব যখন নিজেই তাগো খোজে গেছেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি তাগো লইয়াই ফেরবেন।"

ঠাকুরমাবুড়ির বুকটা ভরসার আনন্দে নেচে ওঠে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন—"তর মুঁখে ফুল চন্দন পরুক—তর কথা সত্য হউক।" বলতে বলতে বুড়ি উঠে গেলেন ঘরের ভেতরে।

নরেন চৌধুরীর ঘরে বসে তাঁর হাত দেখছিলেন এক ভদ্রলোক। হাত দেখতে দেখতে তিনি বললেন—"আমার কথা যদি সত্যি হয়, যদি আপনি মন্ত্রী নির্বাচিত হন, স্যার! তা'হলে দয়া করে আমার ছেলের একটি চাকরি কিন্তু করে দিতেই হবে স্যার···।"

নরেনবাবুর স্ত্রী মায়াদেবী তেমন সময় ঘরে ঢুকলেন। ভদ্র-লোকের কথা শুনে ভুরু কোঁচকালেন। তাকালেন স্বামীর মুখের দিকে! বেশ একটু বিরক্তির চোখেই।

নরেনবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন—"মায়া, গোপেশবাবুই আমার হাত দেখে বলেছিলেন—ভোটে আমি জিতবোই। এখুনি উনি ভবিষ্যৎবাণী করলেন—মন্ত্রিসভাতেও একটা আসন পাবো, মন্ত্রী হবো।"

"কিন্তু তাতে আমার লাভ কী? উনি আমার সম্বন্ধে কিছু ভবিষ্যৎবাণী করতে পারেন তো বুঝি?" বললেন মায়াদেবী। বেশ একটু ভুরু কুঁচকিয়েই।

"তুমি তো হাত দেখাতেই চাও না কাউকে। বলবেন উনি কী করে?" জবাব দিলে নরেন বেশ একটু হতাশার সুরে।

জ্যোতিষী গোপেশবাবু তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। হাত কচ্‌লিয়ে বেশ একটু তোষামুদির সুরেই বললেন—"আমি মা আপনার হাত না-দেখেই বলছি, বৃহস্পতি আপনার তুঙ্গে। আপনি খুব শিগ্‌গিরী একেবারে জোড়া হীরে-মানিক পাবেন।"

মায়া দেবী কোনও কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ভাবনার গোধূলিছায়া নেমে এলো গোপেশবাবুর মুখে!

গোধূলির আলো-আঁধার গ্রামের ওপরে নেমে পড়েছে। নাগ-সাহেবের জীপ গাড়িটা স্টেশনের আঙিনা থেকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। যে-ট্রেনে দুখু-লখুকে সঙ্গে নিয়ে এসে পৌঁছলেন তিনি, সেই ট্রেনটা সবেমাত্র চলতে শুরু করেছে।

জীপের ভেতরে ড্রাইভারের পাশে বসেছেন নাগসাহেব। লখু তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে কি যেন বলতেই নাগসাহেব হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন—"বাস্ রে বাস্! তোর ঐ ছোট্ট মাথাটা দেখছি একেবারে মতলবে ঠাসা!"

"মতলবটা আমার নয়! দাদাভায়ের।" জবাব দিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে আব্দারের সুরে প্রশ্ন করলে—"বলুন না মামাবাবু, মতলবটা কেমন?"

"খুব ভালো!" হেসে জবাব দিলেন নাগসাহেব।

দুখু পেছন থেকে টেনে লখুকে বসিয়ে দিলে। ওদের গাড়িটাও গড়িয়ে নেমে পড়লো মাঠ-বেড়-দেওয়া বড় রাস্তায়। ছুটলো ধূলো উড়িয়ে, ধোঁয়া ছড়িয়ে।

হেমন্তের মেঘলা আকাশ। ধূলোয় ধূলোটে ধোঁয়ায় ঘোলাটে। নেমে-আসা সাঁঝবেলায় সিঁদুর-ঢালা পশ্চিম দিগন্তের পটে। নতুন উদ্বাস্তু নগরীর চাঁছাছোলা নতুন ঘরবাড়ির খাড়া খাড়া কালো কাঠামোগুলো যেন আকাশের ড্রয়িং খাতায় কালো কাগজ-কাটা ছায়াছবি।

টুক্‌রো ছবির সারি সামনে রেখে সূয্যিমামা পাটে বসেছেন। গঙ্গার জলে দিনের আলোর ছিটেফোঁটা টুক্‌রো-কুটো, যেটুকু এখনও ছড়ানো ছিটানো, তাও এখনই কুড়িয়ে নিয়ে বাড়ি ফেরার জন্যে তৈরি তিনি।

ঘরে ফেরার তাগিদে জীপের ভেতরে লখু আর দুখুও আনচান। উঁচু নিচু এবড়ো-খেবড়ো রাস্তাটা সবে তৈরি হচ্ছে। গাড়িটা তাই হোঁচট খেতে খেতে হয়রান! ছুটতে পারছে না পুরোদমে।

নতুন উদ্বাস্তু-নগরীতে গাড়ি যখন পৌঁছলো সন্ধ্যার শাঁখ তখন ঘরে ঘরে হাঁক দিচ্ছে। শাঁখের আওয়াজে বাতাস ফাঁক।

দুখুর ঠাকুরমা ঘরের এককোণে চোখ বুজে বসেছেন। মালা জপ করে আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন ঠাকুরকে। ঘরের মেঝেতে একপাশে টিম্ টিম্ করে জ্বলছিল ভুষোপড়া লণ্ঠনটা।

শাঁখের আওয়াজ শুনে বুড়ি মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে বিড় বিড় করে বলে উঠলেন—"আমার তুখু-লখুরে আইন্যা দাও ঠাকুর।"

ঠিক তেমন সময় পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকলো তুখু আর লখু। তু'জনের ঠোঁটের ওপর নকল গোঁফ লাগানো। চট করে তাদের চেনা দায়। লখু আরও একটু এগিয়ে ঠাকুরমার ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে শব্দ করলে—"মিয়াঁও!"

ঠাকুরমাবুড়ি চোখে ভালো দেখেন না। সত্যি সত্যি বেরাল ঢুকেছে ভেবে, খেঁকিয়ে উঠলেন, বললেন—"যাঃ যাঃ দূর হ মুখপোরা। আবার আইছে আমারে জ্বালাইতে?" কিন্তু যেমনি তিনি বেরাল তাড়াবার জন্যে হাত বাড়িয়ে তালপাতার পাখাটা নিতে গেলেন, ঘুরে বসলেন—অমনি তাঁর চোখ কপালে উঠলো। বললেন—"হা আমার পোরাকপাল, বামন তুইটা এখানে কোন্ কামে? তোরা কে?"

সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্প-সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নাগসাহেব ঘরে ঢুকে বললেন—"চিনতে পারলেন না তো! ওরাই আপনার তু'চোখের তুই মণি।" সঙ্গে সঙ্গে লখু-তুখুও নকল গোঁফ তুটো নাকের ডগা থেকে খুলে ফেলে খিলখিল করে হেসে উঠলো।

"হ! হ! তাইতো দেখি! আমারে বেবাক অবাক কইর‍্যা দেছে।" বলেই বুড়ি উঠে গিয়ে তুখু-লুখুকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। বুড়ির তু'গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো চোখের জল।

ক'বছরে যা হয় নি, ক'দিনেই তাই। নতুন উদ্বাস্তু-নগরে নতুন নতুন গড়ার কাজ। যার যেমন শক্তি-সামর্থ্য, যার যে কাজে আগ্রহ আর দক্ষতা, ছেলেবুড়ো, মেয়েপুরুষ, সবাইকেই তেমন তেমন কাজই করতে দেওয়া হয়েছে।

খয়রতি সাহায্য বন্ধ বটে। হাত-পেট বন্ধ হয় নি। কাজের বদলে সবাই পাচ্ছে মোটামুটি খুশি হওয়ার মতো মজুরি। রীতি-মতো সু-ব্যবস্থা।

সবাই তাই খুশি। ঘরে-বাইরে যে যে-কাজটুকু করছে, মন মেলে প্রাণ ঢেলে। এতদিন পরে কাজ-উদ্যমের সোনার কাঠির ছোঁয়ায় জেগে উঠেছে মানুষগুলোর সঙ্ঘশক্তি। সকলের মন-মহলেই খুলে গেছে অন্ধ ঈর্ষা, স্বার্থবুদ্ধির বন্ধ দরজাজানালাগুলো! উদারতার রোদ পৌঁচচ্ছে মন-বাগিচায়। ফুটে উঠছে সহানুভূতি, সহযোগিতা, ভালবাসার যুঁই-চামেলী, গোলাপ। দুশ্চিন্তা হতাশার মাকড়-ধোকড়রা যে-জাল-জঞ্জালে জড়িয়ে রেখেছিল এতদিন ওদের সবাইকে, সেগুলো ছিঁড়ছে। খসে পড়ছে ক্রমশঃ আলগা হয়ে। আশা-আকাঙ্ক্ষার নতুন হাওয়া পেয়ে।

ক'দিনেই নতুন উদ্বাস্তু-নগরীর প্রতিটি পরিবারে জীবনযাত্রা অনেকখানি স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। খাওয়া-পরা কাজের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থাও। স্কুল চালু হয়েছে। নতুন নগরের নাগরিক হয়ে, স্কুল-কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন উদ্বাস্তুরাই কেউ কেউ।

স্কুল-কমিটির সভাতেই সেদিন দুখুর কথা উঠলো। হেড মাস্টার হারাধন হালদার নিজেই মন্তব্য করলেন, "আশ্চর্য হওয়ার কথাই বটে, দুখু নিজেই এক আশ্চর্য ছেলে!" কমিটির সদস্যরা আরও কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

হেড মাস্টারমশাই বললেন, "এমন কি এই অল্প বয়সেই সে স্কুলের কথা ভাবে! উদ্বাস্তু ছেলেমেয়েগুলোর যে কোথায় কি সমস্যা, তাও মশাই তার নখদর্পণে।"

স্কুল-কমিটির সদস্যা একজন মহিলা শিক্ষয়িত্রী, তরঙ্গিণী দেবীও বলে উঠলেন, "হেড মাস্টারমশায়ের সঙ্গে আমিও একমত। দুখুর চালচলন, কথা-বলা দেখলে শুনলেই মনে হয়, ছেলেটা যেন জন্মেছে নেতা হয়েই। ওর ব্যক্তিত্ব আর ব্যবহারটির জন্যেই ছোটরা ওকে ভালবাসে, মেনে চলে। বড়রাও কেউ কেউ দুখুকে রীতিমত সমীহ করে।"

"সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নাগসাহেবও তো ওর বুদ্ধি-মতলবের তারিফ করেন।" বললেন, কমিটির সদস্য আর একজন শিক্ষক।

বসত-পাওয়া উদ্বাস্তু-প্রতিনিধি, কমিটির সদস্য, বুড়ো বঙ্কু বসাক, দুখুর অত সুখ্যাতি সইতে পারলেন না! গায়ের ঝাল মেটাতে বলে উঠলেন, "নাগসাহেব যখন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, তখন তাঁর উচিত হয় না, অমন কইর‍্যা ঐ পোলাডারে লইয়াই মাতামাতি করা। লোকে কেন্ করব না পক্ষপাতিত্ব?"

হেড মাস্টারমশাই বেশ একটু আঘাতই পেলেন। আবেদনের সুরে বললেন তিনি, "না! না! ভুল বুঝবেন না ব্যাপারটা। দুখুর সঙ্গীসাথী সমবয়সীদের কার কী দুঃখকষ্ট, কী তাদের সমস্যা সেটা জানবার বোঝবার জন্যেই ওর আপ্রাণ চেষ্টা। সেগুলো

বোঝবার এবং বোঝাবার ক্ষমতাও যে ওর কত, তার প্রমাণ সে অনেকবার দিয়েছে। নাগসাহেবও ছোটদের মনের খবর চান। তুখুর কাছেই সে সব পান। তাই কিছুটা নির্ভর করেন ওর ওপর।" কমিটির অন্যান্য সদস্যরা ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন।

"নাগসাহেব আমাদের ওপর অনেকখানি নির্ভর করেন। আমাদের মন কী চায়, কী আমাদের একান্ত দরকার। সেটা প্রত্যেককেই আমাদের খুঁজতে হবে, বুঝতে হবে। বলতে হবে খোলাখুলি নাগসাহেবের কাছে গিয়ে। তা যদি করি আমরা, তা'হলে নিশ্চয়ই উনি ওঁর সাধ্যমতো সাহায্য করবেন।" কথাগুলো বললে তুখু। বড়ো বটগাছটার তলায় যে-ছেলেমেয়ের দল জড়ো হয়েছে, গোল হয়ে বসেছে, তাদের কাছে।

"ক্যাম্‌নে কওন যাইব? সুপারিনটন্ সাহেবের কামরায় বাচ্চাগো ঢুকা নিষেধ না?" প্রশ্ন করলে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে উঠে।

"সে নিষেধ আগে ছিল। এখন নেই। আমি নাগসাহেবকে বুঝিয়ে বলেছি, আমাদের দুঃখ অসুবিধা বুঝতে হলে আমাদের ভালবেসে, বন্ধু হয়ে ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে।" তুখু জবাব দিলে ধীরভাবে।

বুন্ধু ব'লে একটি বড়ো ছেলে, উঠে দাঁড়ালো। বললে, "কাজটা ঠিকই হয়েছে, তবে কি জানিস্ ভাই, আমাদের এমনি পোড়া কপাল যে, যাঁদের আমরা বন্ধু ভাবি, তাঁরা কেউই আমাদের ঠিক পথে চালান না। আবার যাঁদের ওপর আমাদের ঠিক পথে চালাবার দায়িত্ব, তাঁরা আমাদের বন্ধু হতেই চান না। আমাদের সবচেয়ে বড় এবং প্রথম সমস্যাই হলো সেটা।"

দুখু আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠলো—"সমস্যার ব্যাপারটা বুদ্ধু দাদা আরও তলিয়ে ভেবেছে। ওকেই আমাদের দলের নেতা করা উচিত।"

"তুমি ক্যান্ নেতা হইবা না?" ছোট্ট একটি মেয়ে প্রশ্ন করলে দাঁড়িয়ে উঠে।

দুখু হেসে জবাব দিলে—"না ভাই! বয়সে জ্ঞানে যে বড়ো, বুদ্ধি দক্ষতা যার বেশি, আমাদের উচিত সব সময়ে তেমন কারুর হাতে নেতার কাজ দেওয়া।"

"নেতার দায়িত্ব কেডা কারে দেয় শুনি? আমরা তো দেখতে আছি, আমাগো বাপদাদারা হগ্গলেই নেতা হওনের জন্য ব্যস্ত। বড়রা যা করতে আছে, তাগো উদাহরণ দেইখ্যাই চলুম আমরা।" বেশ গম্ভীরভাবে কথাগুলো বললে ননীগোপাল। দুখুরই সমবয়সী একটি ছেলে।

দুখু তার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। হাল্কা হাসিতে মুখ রাঙা করে বললে, "না ভাই না, ও উদাহরণটা খুব ভালো নয়। যদি সত্যি সত্যি আমরা আমাদের উন্নতি ও সুখের জন্য দল গড়তে চাই, তা'হলে তেমন কাউকেই নেতা করতে হবে, যাকে আমরা খুসী-মনে মেনে চলতে পারবো, ভালবাসতে পারবো।"

আর একটি মেয়ে বললে, "তাই যদি কও হেইলে তো আমাগো ভিতর থাইক্যা কারেও নেতা বাইছা নেওন লাগবো।"

দুখু আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো, "ঠিক ঠিক! খুব ভালো কথা বলেছে রানী। আমিও এটাই চাচ্ছিলাম। আমি প্রস্তাব করছি, বুদ্ধু দাদাকেই আমাদের নেতা ঠিক করা হোক। এ প্রস্তাবে যাদের যাদের আপত্তি নেই, তারা সবাই হাত তোলো।"

দুখুর প্রস্তাবে হয়তো যাদুমন্ত্রই ছিল। খুশি মনে হৈ চৈ করে সবাই একসঙ্গে হাত তুলে বুদ্ধুকেই 'নবজীবন কিশোর সঙ্ঘের' নেতা নির্বাচিত করলে।

"হাত নামাও। কথা থামাও।" হুকুমটা এলো লখুর মুখ থেকে। 'নবজীবন কিশোর সঙ্ঘের' কুঁড়িচক্রের নায়িকা লখু। পাঁচ-সাত বছরের গোটা চল্লিশেক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আঁকা-বাঁকা লাইনে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছিল হাত তুলে। লখুর হুকুম মতো ঝপ্‌ করে সবাই হাত নামিয়ে নিল।

দেখা গেল, মাঠের একধারে ঐ সব ছেলেমেয়েদের মা-মাসীরা জড়ো হয়ে ওদের কাণ্ডকারখানা দেখছেন। দুখুর ঠাকুরমাও রয়েছেন তাঁদের মধ্যে।

"হাত দুটো পাখির ডানার মতো মেলো।" লখুর হুকুম আবার শোনা গেল। ছেলেমেয়েগুলো তড়িক ঘড়িক করলেও তাই।

এবার লখুর হুকুম হলো—"উড়ে যাও সব কাক। কা-কা ডাকে লাগাও তাক।" সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েদের দল যে যার হাতদুটোকে ডানার মতো নাড়িয়ে কা-কা কা-কা করে কাকের মতো ডাকতে ডাকতে দৌড়লো।

মাঠের চারপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন যাঁরা, সেই মা-মাসীর দল, ওদের ঐ মজার খেলা দেখে হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়লেন। অনেক দিন পরে ওঁরা সবাই একসঙ্গে এমন করে হাসবার সুযোগ পেলেন।

হাসির হট্টগোলে সবাই যখন মত্ত, সেই ফাঁকেই খেলার ছবিটা আবার বদলে গেছে।

হঠাৎ 'প্যাঁক! প্যাঁক! প্যাঁক!' চিৎকারে সবাই চমকে উঠলো। চোখ ঘোরাতেই দেখা গেল—লখু ছেলেমেয়েগুলোকে হাঁস হওয়ার হুকুম দিয়েছে। মাটির ওপর উবু হয়ে বসে হাঁটু ধরে এগুচ্ছে সবাই। ঠিক যেন হাঁসেরাই দল বেঁধে চলেছে। প্যাঁক প্যাঁক শব্দে পাড়া মাৎ।

মা-মাসীর দলের মুখে হাসি আর কথার জোয়ার এসেছে তাই দেখে। তাঁদের দলের ভেতর একজন আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। বললেন দুখুর ঠাকুরমার দিকে তাকিয়ে, "অবাক হইয়া ভাবতে আছি দিদি, পোলাপানগুলোর মধ্যে কিসে এমুন নতুন জীবন আইন্যা দিল।"

দুখুর ঠাকুরমা জবাব দিলেন—"উৎসাহ আর পারিপাশ্বকটা পাইতে আছে ভালই, তাই!" ঠাকুরমা কথাটা ঠিকই বলেছেন। উপযুক্ত পরিবেশ আর উৎসাহ পেয়েই 'নবজীবন কিশোর সঙ্ঘে' নতুন জীবনের নতুন আনন্দ এসেছে। শিশু আর কচি-কিশোরদের জীবন গড়ে ওঠে, বেড়ে ওঠে, ও দু'টি ঠিকমতো পেলেই। লখুরও শুরু হয়েছে নতুন জীবন।

বাইশ

পারিপার্শ্বিক অবস্থা-ব্যবস্থার পরিবর্তন উন্নতির দিকেই। এক মাসেই বেচারা উদ্বাস্তুদের হাল-চাল অনেক পাল্টেছে। নতুন উদ্বাস্তু-নগরীর পথেঘাটে, লোকের মুখে মুখে ঐ একই কথা। একই আলোচনা। সবাই বলছে—সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী বদলিয়েছে।

বুদ্ধুর নেতৃত্বে, দুখুর পরামর্শে ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো

সবাই এক হয়েছে। তাদের একতা, নিয়মশৃঙ্খলায় 'নবজীবন কিশোর সঙ্ঘ' জীবন্ত। নতুন জীবনের জয়পতাকা তুলে ধরেছে ওরাই। সবাইকে এগিয়ে চলার, কাজ করার—প্রেরণা যোগাচ্ছে ছোট্ট ঐ ছেলে ছুটোই।

তাই বুদ্ধু আর দুখুরও চিন্তা-পরামর্শের শেষ নেই। পথ চলতে চলতে সেদিন ওরা সেই কথাই আলোচনা করছিল।

বুদ্ধু বললে—"উৎসাহ যেভাবে পাচ্ছি, পরিবেশটা যেভাবে বদলাচ্ছে, তা খুব ভালোই বলা চলে; কিন্তু ভাই ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের এখনও অনেক উন্নতি হওয়া দরকার।"

"সেইজন্যেই তো নাগসাহেবকে আমি বলছি ঘুরে ফিরে সব জানতে হবে। নিজের চোখে কানে দেখতে শুনতে হবে।" জবাব দিলে দুখু হাঁটতে হাঁটতেই।

"খোলাখুলি সব কথা বললে হয় না রে?" প্রশ্ন করে বুদ্ধু।

"বলার চেয়ে, চোখে আঙুল দিয়ে সব জিনিস দেখানোই ভাল।" হেসে জবাব দিলে দুখু। বুদ্ধুও একটু ভেবে নিয়ে, ঘাড় নাড়লে। চললো ওরা এগিয়ে। ইস্কুলের দিকে।

উদ্বাস্তুনগরীর নতুন স্কুল। হালফ্যাশনের প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি। ছবির মতো সুন্দর। স্কুল বাড়ির সামনের মাঠটায় ছেলে-মেয়েরা জটলা করছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দূর থেকে নজরে এলো—নাগসাহেবের চেহারাখানা এগিয়ে আসছে। খোলা মাঠের এলোমেলো বাতাসের সঙ্গে লড়াই করতে করতে এগিয়ে আসছেন তিনি, সাইকেল চেপে সাঁই সাঁই করে।

ফটকের সামনে আসতেই নাগসাহেবেরও চোখ গেলো ওদের দিকে। স্কুলের সময় ক্লাশের বাইরে, মাঠে কেন সবাই! দেখেই তিনি নেমে পড়লেন ঝট্ করে সাইকেল থেকে।

জিজ্ঞেস করলেন—"ব্যাপার কি হে? ঘণ্টা তো অনেকক্ষণ বেজে গেছে! ক্লাশে যাও নি কেন তোমরা?"

একদল ছেলেমেয়ে নমস্কার করে তাঁর কাছে এগিয়ে গেল। বেশ সহজভাবে বললে—"এখনও আমাগো পড়ার বইগুলো পোঁছায় নি স্যার! তাই হেড মাস্টারমশাই আমাগো ছুটি দিয়েছেন, খেলবার কয়ছেন।"

একটি তোৎলা ছেলে তোৎলাতে তোৎলাতে বললে—"স্যা-স্যা স্যার! গ-গ-গ-ভ্তোবার-আ-আ-আ আমাগো বই আসছিল ন-ন-নয় মাস প-প-পরে। অখন আ-আ-আমাগো ন-ন-নতুন স্কুল বিল্ডিনটাই পাইছি, প-প-পড়ার ব-ব বইগুলা আইস্যা প-প-পউছায় নাই।"

ছেলেমেয়েগুলো সবাই হেসে উঠলো, ঐ ছেলেটার কথা শুনে। নাগসাহেবের মুখখানা চিন্তা আর লজ্জায় কালো হয়ে উঠলো। বললেন তিনি—"তাই নাকি! ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। তোমরা যাতে খুব শিগ্‌গিরী বই পাও তার ব্যবস্থা আমি করছি।" বলেই নাগসাহেব চড়ে পড়লেন তাঁর লোহার পক্ষীরাজ সাইকেলের পিঠে। সাঁই সাঁই ফিরে চললেন আপিসের দিকে।

সেদিন সন্ধেবেলা জড়ো হয়েছে একদল মেয়ে। উদ্বাস্তু-নগরীর একটা বাড়ির বারান্দায়। গান ধরেছে সবাই গলা মিলিয়ে।

দূর থেকে ওদের গান শুনে দুখু সেখানে হাজির। জিজ্ঞেস

করলে—"মেয়েদের জন্যে তো সন্ধ্যাবেলা গানের ক্লাশের ব্যবস্থা হয়েছে। গান শিখতে সেখানে তোমরা যাও নি কেন?"

একটি মেয়ে হি হি করে হেসে উঠলো। জবাব দিলে—"সেখানে সুস্থির হয়ে গান করবার যো নাই। অস্থির করবার জন্য একদল সেখানে আগেই হাজির থাকে।"

দুখু বেশ একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"নাগসাহেবকে দেখাতে পারো সেই অসভ্যদের।"

"অবশ্যই পারি। যদি তিনি দয়া কইর‍্যা আমাগো ক্লাশে আসেন!" বললে আর একটি মেয়ে, বেশ গম্ভীর ভাবেই।

"আসবেন, নিশ্চয়ই আসবেন। আমি তাঁকে কালই সঙ্গে করে নিয়ে যাব। তোমরা থেকো সেখানে।" জবাব দিলে দুখু। ওদের অসুবিধা ঘোচাবার সঙ্কল্প আর চিন্তার রেখায় মুখটা ভারি করে।

"অনেক ধন্যবাদ।" মেয়েটি হেসে বললে। দুখু বিরাট এক দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে পা বাড়ালে। তখনই নাগসাহেবের কাছে ব্যাপারটা জানিয়ে আসার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

পরের দিন সন্ধ্যায়। মেয়েদের গানের ক্লাশ যে ঘরে বসে, সেই ঘরের দেওয়াল কালো করে ঝাঁকে ঝাঁকে মশা এসে আসর বসিয়েছে। গুনগুনিয়ে গান ধরেছে তারাও।

ট্যারা-চোখ গানের মাস্টার চিন্তাহরণবাবু। ভাঙা একটা হারমোনিয়ামের রীড টিপে ধরে মেয়েদের গান শেখাচ্ছেন। গাইছেন বেয়াড়া সুরে গানের একটা কলি বার বার। মেয়েরাও বেসুরে তাই আউড়াচ্ছে। তাল তাদেরও বেতাল। মশা-মারার

চাপড়ানি আর চুলকানির সঙ্গে তাল বজায় রাখতে গিয়েই, ওরা সুর তাল লয়—সব গুলিয়ে ফেলছে।

ওদের পেছন থেকে ঘরের জানলাটা খুললে তুখু। অসভ্যের দলটাকে ক্যাম্প-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে দেখাবে বলে। নাগসাহেবও মশা মারতে মারতে ব্যাপারটা ধরে ফেললেন। তুখুও বুঝলো মেয়েরা রীতিমত রগড় করেছে। মনে মনে সে চট্‌লো একটু।

গানের মাস্টারও চটে উঠেছেন। চেঁচিয়ে উঠলেন—"তাল বজায় রেখে গান যদি না পারবে বাপু, তবে এলে কেন আমার আফিমের মৌজটা মাটি করতে ?"

"কি করে তাল রাখি কন ? মশাগুলো যে বেয়াড়া বেতালা কামড় দিতে আছে।" জবাব দিলে একটি মুখফোঁড় মেয়ে।

গানের মাস্টারমশাই ঝিমুতে ঝিমুতে চোখ বুজেই বিড় বিড় ক'রে জবাব দিলে—"ম-শা কো-থায় ? আমাকে তো কামড়ায় না ! হ্যাঁ ! হ্যাঁ, কামড়াবে কোন্ সাহসে ? বারো বছর আফিম খাচ্ছি বাবা। আমার রক্ত মশাবেটাদের পেটে গেলেই অপঘাতে মৃত্যু !"

জানলা ছেড়ে নাগসাহেব আর তুখু তখন গানের ক্লাশে ঢুকে পড়েছে। নাগসাহেব মেয়েদের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন—"দেখেছি মা! বুঝতে বাকি নেই! কাদের উৎপাতের ভয়ে তোমরা গানের ক্লাশে আসো না। কাল থেকেই আমি নতুন স্কুল বাড়িতে তোমাদের গানের ক্লাশের ব্যবস্থা করে দেবো। আর ভালো দেখে নতুন গানের মাস্টারও বহাল করবো। হবে তো তা'হলে ?"

মেয়েরা একসঙ্গে বলে উঠলো,—"খুব ভালো হবে! আমরা কিন্তু গানের সাথে নাচও শিখবার চাই।"

"বেশ তো! সে ব্যবস্থাও মঞ্জুর করিয়ে আনবো, নতুন মন্ত্রী মশায়ের কাছ থেকে। তোমরা এখন বাড়ি যাও।"

মেয়ের দল হাসাহাসি করে বেরিয়ে গেল।

ট্যারাচোখ গানের মাস্টারের চোখ আরও ট্যারা হয়ে গেছে তখন। কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এলেন তিনি। ক্যাম্প-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নাগসাহেবের সামনে। জোড়হাতে আম্‌তা আম্‌তা করে বললেন—"স্যার! নতুন গানের মাস্টার এলে আমি খাবো কি! করবো কি হুজুর!"

"কেন? আফিং খাবেন, আরো একটু বেশী করে। আফিং খেয়ে একেবারে এমন ঘুম দেবেন, যাতে জাগতে না হয়।"

বলেই নাগসাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। দুখুও সঙ্গে সঙ্গে গেল। গানের মাস্টার চোখ বুজে ঝিমোতে লাগলো নেশার ঘোরে।

তেইশ

"লখু, অনেক রাইত অইছে, তুই খাইয়া লইয়া ঘুমা গিয়া।" বললেন লখুর ঠাকুরমা ঝিমোতে ঝিমোতে।

কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়ে লখু একটা পেঁচার ছবি আঁকছে। লণ্ঠনটা সামনেই রয়েছে। ঠাকুরমার কথা শুনে, ছবি আঁকতে আঁকতেই জবাব দিলে—"বারে! কেমন করে ঘুমাবো, দাদাভাই যে ফেরে নাই।"

"দাদাভায়ের কথা ছাড়ান দে। হে অখন নেতা অইছে। ফেরবো কখন কেডা জানে!" কথাগুলো বললেন ঠাকুরমা বেশ একটু বিরক্ত হয়েই।

লখুও মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিয়ে চোখ তুললে। দুষ্টুমির হাসি হেসে বললে, "দাদাভাইয়েরে হিংসা করো না ঠাকুরমা। তোমারেও শিগ্গিরী ঠাকুরমা-ঠান্দিদির দলের নেতা হতে হবে।"

ঠাকুরমা ভুরু কুঁচকিয়ে প্রশ্ন করলেন—"কওস কিরে তুই? খবরডা কার কাছে পাইছস?"

লখু নরম ঠোঁট দু'খানা বাঁকিয়ে মুচকি হেসে বললে—"খবর সব দাদাভাই জানে—তাকেই জিজ্ঞেস করো।"

লখুর কথায় ঠাকুরমার ভাবনা বাড়ে। মাথা চুলকোতে চুলকোতে জপের মালা নাড়েন।

নরেন চৌধুরী নতুন উদ্বাস্তু-মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন। অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে জ্যোতিষীর কথা। মন্ত্রী হয়ে অবধি ফুরসৎ নেই তাঁর। সকালে বাড়িতে দেখা-সাক্ষাতের পালা। উদ্বাস্তুদের নানা অভিযোগ-আবেদন শুনতে শুনতেই আলা। তারপরে দপ্তরে গিয়ে আরও হাজার ঝামেলা! বিশেষ করে উদ্বাস্তুদের হারানো ছেলেমেয়ে আর আত্মীয়দের খোঁজখবরের ফাইল আর কাজেই তিনি চাপা পড়ে থাকেন। নিজের হারানো মা আর ছেলেটার খোঁজ করবার অবসর মেলে না।

নরেনবাবুর স্ত্রী মায়াদেবী যে তাঁর নিজের শাশুড়ী আর ছেলের খোঁজ চেয়ে মন্ত্রীমশাইকে একটু তাগিদ দেবেন, সে সুযোগটুকুও তিনি পান না।

পাবেন কখন! মন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই নরেনবাবু কাজে-অকাজের চড়ক-গাছে চরকী ঘুরছেন। সব সময়ই তিনি ব্যস্ত,

সবসময়েই যেন আনমনা। মায়াদেবী কথা কয়ে জবাবই পান না। পেলেও সে-সব জবাবের কোনও মানেও হয় না।

মন্ত্রী নরেন চৌধুরীর যন্ত্রণায় দেশসুদ্ধ লোকের কল্যাণ হতে পারে। কিন্তু মন্ত্রী-গিন্নী মায়ার যন্ত্রণাটা কেউ ভাবে না, কেউ বোঝে না।

মায়াদেবী অবুঝ নন। তিনি বোঝেন যশ আর প্রতিষ্ঠার নেশায় মানুষ কতটা মাতাল হয়! বোঝেন ঘরের দুঃখ নিয়ে মাথা ঘামালে পরের দুঃখ ঘোচানো যায় না। তাই মায়াদেবী চুপ করেই থাকেন। মনের দুঃখ মনে চেপে আড়ালেই কাঁদেন। আড়াল থেকে শোনেন শতজনের শত কান্না ঘোচাবার জন্যে স্বামী তাঁর ব্যস্ত!

সেদিন সকালবেলায়—নরেনবাবু তাঁর বাড়ির আপিসঘরে বসে এই সব কাজই করছিলেন। নানা জনের সঙ্গে নানান জিজ্ঞাসা-বাদেই ব্যস্ত তিনি।

এক ভদ্রলোক আর তাঁর স্ত্রী এসেছেন। তাঁদের হারানো দু'টি ছেলেমেয়ে আর বুড়ি মায়ের খোঁজে। নতুন উদ্বাস্তু-মন্ত্রী নরেনবাবুর বাড়িতে দরবার করতে। আর্জি জানাতে।

মন্ত্রী নরেনবাবু তাঁদের সঙ্গেই কথা বলছিলেন। হঠাৎ তিনি বললেন—"একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?"

ভদ্রলোকটি বললেন—"বলুন স্যার?"

"আচ্ছা আপনার বুড়ো মা আর ছেলেমেয়ে দু'টিকে ঘরে রেখে পালিয়ে ছিলেন কেন?" প্রশ্ন করলেন নরেন চৌধুরী।

"আজ্ঞে! পালাই নি আমরা। ব্যাপারটা হলো, যেদিন

রাত্রে আমাদের গ্রামে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধলো, সেদিন আমরা দু'জনেই দূরের একটা গ্রামে পার্টির মিটিং নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।" বললেন ভদ্রলোক বেশ সম্ভ্রমভরেই।

জবাব শুনেই নরেন চৌধুরী চমকে ওঠেন। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—"ঠিক ঐরকম করেই, আমিও আমার একমাত্র ছেলে আর বুড়ো মা'টিকে হারিয়েছি—"

মহিলাটি ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন—"বলেন কি! আপনার নিজের মা ছেলের খোঁজ পান নাই?"

"না! খোঁজ পাওয়া ভারী শক্ত। তবে কি জানেন, উদ্বাস্তু-দপ্তরের মন্ত্রী হবার পর নিজেই আমি ঐ খোঁজখবরের কাজটা নিয়েছি। অনেক হারানিধিকে তাদের মা-বাপের বুকে ফিরিয়ে এনে দিতে পেরেছি।" বললেন উদ্বাস্তু-মন্ত্রী চাপা দুঃখের কাঁপা গলায়।

"সেই সব কথা শুনেই তো আমরাও ছুটে এসেছি স্যার। জানতাম না তো যে, আপনার নিজের ছেলেটারই কোনও খোঁজ নেই।" বললেন ভদ্রলোক। কথায় কিছুটা হতাশার সুর।

"আমাদের মতো অভাগা মা-বাপের হারানো ছেলেমেয়েগুলির সন্ধান পাওয়ার জন্যে আপনি যা করতে আছেন, তার জন্যই ভগবান আপনার মা-ছেলেকে খুঁজে দেবেন।" বললেন ভদ্র-মহিলা বেশ সহজভাবেই।

নরেন চৌধুরী আর বসে থাকতে পারলেন না। বললেন—"পারলে ভগবনই পারেন, তিনি আপনাদেরও হারানো ছেলেমেয়ে দুটিকে আর বুড়ো মাকে খুঁজে এনে দিন, এই আমার প্রার্থনা।"

নরেন চৌধুরীকে উঠে দাঁড়াতে দেখে আগন্তুক ভদ্রলোক ও

ভদ্রমহিলাটিও উঠে পড়েছেন। ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে বললেন—"চল আমরা এখন যাই, অনেক লোক এখনও বাইরে অপেক্ষা করছে।"

ওঁরা বাইরে যেতেই পাঁড়েজী ঘরে ঢুকলো। নরেনবাবু টেবিলের কাগজ আর ফাইলের স্তূপ গুছোতে গুছোতে বললেন—"পাঁড়েজী! আগে সেই সব লোককে পাঠিয়ে দাও—যারা পরের ছেলে কুড়িয়ে পেয়েছে, মানুষ করছে। তার পরে তাঁদের পাঠাবে, যারা নিজেদের ছেলেমেয়েরা আত্মীয়ের খোঁজে এসেছে, বুঝলে?"

পাঁড়েজী ঘাড় নেড়ে, আড় চোখে তাকালে দেওয়ালের ঘড়িটার দিকে। কি যেন বলবে বলবে করেও বলতে না পেরে, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, মন্ত্রী-মনিবের হুকুম তামিল করতে। চোখে-মুখে ভাবনা-বিরক্তির কালি মাখিয়ে। ঘড়ির কাঁটা সাড়ে বারোটার ঘাড়ে পা দিয়েছে তখন। হুজুর দপ্তরে যাবেন কখন!

চব্বিশ

হেড মাস্টার হারাধনবাবু একটা চিঠি পড়ছিলেন। নাকের চশমা কপালে তুলে। খুব মনোযোগ দিয়ে। তাঁর সামনে টেবিলের ওপর বাণ্ডিল বাণ্ডিল বইয়ের আণ্ডিল। কয়েকজন মাস্টারমশাই টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে বাণ্ডিলগুলো খুলছিলেন। বইগুলো গুনে-গেঁথে বইয়ের লিস্টে হিসাব মেলাচ্ছেন।

দুখু ঘরে ঢুকলো। হেড মাস্টার আর মাস্টারমশাইদের

নমস্কার জানিয়ে জিজ্ঞেস করলে হেড মাস্টারমশাইকে—"আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন স্যার ?"

"হ্যাঁ বাবা!" হেসে বললেন হেড মাস্টারমশাই, "তোমার মতলবেই কাজ হয়েছে! দেখোনা, এক সপ্তাহের মধ্যেই সক্কলের সব বই পৌঁছে গেছে। বুদ্ধির বাহাদুরী আছে তোমার!"

দুখু মেঝের দিকে তাকিয়ে মাথা হেঁট করে বললে—"বাহাদুরী আমার নয় স্যার! এ-সবই হয়েছে, সবাইকে আপনি সেদিন বাইরে খেলতে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন বলে।"

"অনুমতিটা আমি দিয়েছিলুম বটে; কিন্তু সেটা আদায় করেছিলে তুমিই তো ? সমস্ত কথা নাগসাহেবকে বলেছি আমি। তিনিও মন্ত্রীমশায়ের কাছে আদ্যোপান্ত সব লিখেছিলেন।" বললেন হেড মাস্টারমশাই মাথা নাড়তে নাড়তে।

হেড মাস্টারমশাইয়ের কথা শুনে দুখু যেন বেশ একটু ঘাবড়িয়ে গেল। ভয় ভাবনায় শুকনো মুখে প্রশ্ন করলে—"নাগ-সাহেব জেনেছেন ? মন্ত্রীমশাইকে জানিয়েছেন !"

দুখু ঘাবড়িয়ে গেছে দেখে, হেড মাস্টার হাত বাড়িয়ে দুখুকে কাছে টেনে নিলেন। পিঠ চাপড়ে ভরসা দিয়ে হেসে বললেন—"জানালেই বা, ভয়ের কিছু নেই বাবা, বরং ভালই হয়েছে। নতুন মন্ত্রীমশাই সঙ্গে সঙ্গে কী হুকুম দিয়েছেন জানো ?"

দুখু আরও ভয় পেয়ে কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলে—"কী স্যার ?"

"হুকুম দিয়েছেন—যেখানে যতো উদ্বাস্তু-শিবির আছে, উদ্বাস্তু-পল্লী আছে, সব জায়গায় ছোটদের অভাব চাহিদাগুলো তড়িক-ঘড়িক মেটাতেই হবে। সব আগে দৃষ্টি দিতে হবে

ছোটদের দিকে।” বললেন হেড মাস্টারমশাই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে।

দুখুর চোখ দুটোতে জল চিক চিক করে উঠলো। আনন্দ আর কৃতজ্ঞতার উত্তেজনায়। বলে উঠলো—“নতুন উদ্বাস্তু-মন্ত্রী তো খুব ভালো স্যার!”

“ভালো বলতেই হবে, যখন এরকম হুকুম দিয়েছেন।” বললেন আর একজন মাস্টারমশাই পাশ থেকে। আর সবাই হেসে ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন।

সেদিন মাঝ রাত্তিরে। চারধার-বন্ধ ঘরে, পার্টির গোপন মিটিং চলেছে। শোনা গেল,—“নতুন উদ্বাস্তু-মন্ত্রী সত্যি সত্যি যদি এ রকম সব হুকুম জাহির করে থাকেন, তা'হলে আর হাত পা গুটিয়ে আমাদের চুপ করে বসে থাকা, চলবে না। নতুন মন্ত্রীর ঐ সব নতুন ব্যবস্থার উল্টো ব্যাখ্যা দরকার। উদ্বাস্তুদের ক্ষেপিয়ে তুলতে হবে। আন্দোলন শুরু করতে হবে সমস্ত নতুন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে।” কথাগুলো বললেন হাত-পা ছুঁড়ে সুযোগ-সন্ধানী সভাপতি সিংহমশাই। সেই টাকপড়া পেটমোটা নেতাটি।

পার্টির একজন সদস্য রামলাল। বয়স চব্বিশের কাছাকাছি। প্রশ্ন করলে—“কেমন কইর‍্যা সম্ভব সেইডা? উদ্বাস্তুগো প্রায় হগ্‌গলেরই ছাওয়াল পাওয়াল আছে। কাজেই নূতন উদ্বাস্তু-মন্ত্রী তাগো পোলাপানের কল্যাণের লাইগ্যা কাম করতে আছেন জানলে, তারা খুশিই অইবো।”

“অইবই তো! তাছারা আমি আরও যে খবরটা পাইছি,

সেটাও ভাইব্যা দেখার মতো।" বললে শঙ্কর বলে আর একজন। বয়স তার তিরিশের কাছাকাছি।

সভাপতি সিংহমশাই নড়ে বসলেন। বেশ চটে উঠেই প্রশ্ন করলেন শঙ্করকে—"ভাবনার ব্যাপারটা তোমার শুনতে পারি কি?"

জবাবটা সতীশই দিলে। বললে—"নতুন উদ্বাস্তু-নগরীর যতো সব বুড়ো ঠাকুরমা-ঠাকুরদার দল তারাও একটা সভা ডেকেছিল। সভায় সবাই মিলে ঠিক করেছে, তারাও ঐ উদ্বাস্তু-নগরীর ছোটদের খেলাবাড়ি তৈরী করার কাজে লাগবে। শ্রমদান করবে, মজুরি মাইনে না নিয়েই।"

"বলি কার নেতৃত্বে বুড়ো-বুড়িদের সভাটা হয়েছিল সেটা জেনে এসেছ কি?" প্রশ্ন করলেন পার্টির নেতা সিংহমশাই। বেশ গম্ভীর গলাতেই!

"আজ্ঞে হ্যাঁ। বুড়ি থুত্থুড়ি এক ঠাকুরমা। সবাই ডাকে তারে 'পাগলী মা' বলেই। সতীশই জবাব দিলে।

সভাপতিমশাই আর তাঁর মোসাহেব সদস্যরা সতীশের দিকে কট্‌মট্ করে তাকালেন। সিংহমশাই ঠাট্টা করে বললেন—"হয়েছে! হয়েছে বাপু! থামো। যত্তো সব পাগলামী কাণ্ড!"

সতীশ অনুনয়ের সুরে বললে—"আজ্ঞে না! আপনারা যদি উদ্বাস্তু নগরীর শিশু-কল্যাণ কাজগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে যান, সেটাই এর চেয়ে বড় পাগলামী হবে।"

শঙ্কর ঘাড় নেড়ে সতীশের কথায় সায় দিলে।

নেতা সিংহমশাই চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলেন—"আস্পর্ধা তো তোমার কম নয় হে! আমাদের আন্দোলনকে পাগলামী বলছো কোন্ সাহসে?"

"আজ্ঞে! অনুতাপের চাবুক খেলে যে সাহসটা ফিরে আসে। আপনাদের দলে পড়ে উদ্বাস্তু মা-বোন ভাইদের ক্ষেপিয়ে তুলেছি। দিনের পর দিন হাজার হাজার বিপন্ন জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছি। অনুতপ্ত আজ আমি।—"

"শাট আপ! বেরিয়ে যাও এখনি তুমি! পার্টিদ্রোহী! বিশ্বাসঘাতক!" ধমকে থামিয়ে দিলেন সিংহমশাই সতীশকে। সতীশের বাকি কথাগুলি আর বলা হলো না!

সিংহমশাইয়ের পার্শ্বচররাও বলে উঠলেন—"ঘাড় ধরে বের করে দাও।"

"বের করে দিতে হবে না। বেরিয়ে যাবো বলেই তৈরী হয়ে এসেছি।" বলেই সতীশ ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কর ও রামলালও উঠে দাঁড়ালো। সতীশের পিছু নিয়ে সভা ছেড়ে যাওয়ার জন্য তারাও পা বাড়ালো।

"তোমরা কেন যাচ্ছো?" সভাপতিমশাই গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন রামলাল আর শঙ্করকে।

রামলাল জবাব দিলে—"আমার বুড়ো ঠাকুরদায় যে আমারে অভিশাপ দিবো যদি আমি ভালো ভালো কামের বিরুদ্ধে আন্দোলন করি।"

শঙ্কর বললে—"আমার ছোট ভাইবোনগুলা আমার গায়ে থুক্ দিবো, আমি যদি তাগো লগে নতুন যুগ গইরা তোলবার কামে হাত না লাগাই।"

ওরা তিনজনেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পঁচিশ

নতুন যুগই এনেছে নবযুগের নবীন দল, ছেলেমেয়েরা। ওরাই নতুন উদ্বাস্তুনগরীর নাম দিয়েছে 'রূপনগর'। নামটা সকলেরই খুব পছন্দ। সরকারও ঐ নামটাই মেনে নিয়েছে।

শুধু কি তাই! নতুন কাজে মেতে ওঠার জন্যে সকলকে মাতিয়ে তোলার জন্যে কবিগুরুর একটি গানও ওরা বেছে নিয়েছে। গানটা ভারী সুন্দর। আরও সুন্দর লাগে যখন 'রূপনগরে'র ছোটবড়ো সবাই একসঙ্গে গানটা গায়। গাঁইতি, কোদাল, ঝুড়ি, খোন্তা কাঁধে তুলে তালে তালে পা ফেলে সবাই যখন গান গাইতে গাইতে কাজে যায়। ঐ গানটা গেয়েই ওরা কাজ করে। কাজের শেষে ঘরে ফেরে।

সেদিন সকালে 'রূপনগর' উদ্বাস্তু নগরীর ছেলেমেয়েরা তালে তালে পা ফেলে চলেছে। গাঁইতি, কোদাল, খোন্তা, ঝুড়ি ঘাড়ে নিয়ে গানের সুরে বাতাস কাঁপিয়ে। সকালের আকাশের মুখখানা রাঙা। সূর্যিমামার ছড়ানো মুঠো মুঠো রোদের আবীর মেখে।

"নতুন যুগের ভোরে, দিস্‌নে সময় কাটিয়ে বৃথা সময় বিচার করে।"……গানের কলিটা ঘুরে ফিরে শোনা যাচ্ছে। পাখিদের কাকলীর মতো। রূপনগরের নতুন ঘরবাড়ির আশপাশের রাস্তা গলি দিয়ে ওরা যতই এগুচ্ছে, ততই ওদের দলে ভিড় বাড়ছে। গানের কাঁপন, সুরের নাচনের ছোঁয়ায় সবারই মনে মাতন লেগেছে। ছেলে বুড়ো ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কান রাখছে ওদের গানে।

গানের সাড়ায় জড়তা-হতাশার ঘুম ভাঙছে কারুর কারুর প্রাণে। মা-বাবা, বুড়ো-বুড়ি, ঠাকুরমা, ঠাকুরদারাও কেউ কেউ ওদের দলে ভিড়েছে। এগিয়ে চলেছে বয়স ভুলে, মান-অভিমান শিকেয় তুলে।

শেষমেশ দেখা গেল, ছেলেবুড়ো সব্বাই দল বেঁধে কাজে লেগে পড়েছে, গান গাইতে গাইতে! ঝোপঝাড় জঙ্গল কাটছে। জঞ্জাল সরিয়ে সাফ্ করছে একটা মস্ত জমি। ঐ জমিটাতেই রূপনগরের উদ্বাস্তু ভাইবোনেরা তাদের খেলা-বাড়ি—'রূপনগর শিশুভবন' তৈরী করে নেবে বলে ঠিক করেছে। শ্রমদানের কাজে তাই ওরা মেতে উঠেছে—ভারী খুশি-মনে।

এই খুশি-আশার খবরটাই শোনাচ্ছিলেন নাগসাহেব টেলিফোন কানে তুলে। বলছিলেন এসব কথাই নতুন উদ্বাস্তু-মন্ত্রী নরেন চৌধুরীমশাইকে। নাগসাহেবের অফিস-ঘরের জানালা গলে ভেসে আসছে ঐ কাজের দলের গান। চুপি চুপি ঢুকে পড়ছে, টেলিফোনের চোঙা-কলে!

টেলিফোনের তার বেয়ে সেই গানের রেশও পৌঁছুচ্ছে মন্ত্রীমশায়ের কানে—নাগসাহেবের কথাগুলোর পেছনে আবছা ছায়ার মতো।

নাগসাহেব এধারে ফোনের চোঙায় মুখ রেখে বললেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার! কাজ একেবারে পুরোদমেই চলেছে। গানটা ওদেরই। আপনার নতুন সব পরিকল্পনার কথা জেনে এখানে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বুড়োবুড়ীরাও মেতে উঠেছে।"

মন্ত্রী নরেন চৌধুরীমশাই তাঁর অফিস-ঘরে চেয়ারে ঠেসান দিয়ে

টেলিফোনেই প্রশ্ন করলেন—"তাতো হলো, কিন্তু নওজোয়ানদের মতিগতিটা কোন্ দিকে ?"

ক্যাম্প-সুপারিণ্টেডেণ্ট নাগসাহেব ফোনেই জবাব দিলেন "আজ্ঞে মতিগতি বদলেছে। তারাও তাদের ছোট ছোট ভাই-বোনদের কাণ্ডকারখানা দেখে আগের চেয়ে অনেক উৎসাহিত হয়েছে!"

"উৎসাহটা কোন্ দিকে ?" প্রশ্ন করলেন মন্ত্রী নরেন চৌধুরী।

"আপনি শুনে খুশি হবেন স্যার। বেশীর ভাগ ছোকরাই জানিয়েছে, আপনার শিশু-কল্যাণ প্রোগ্রামের বিরুদ্ধে তারা কোনও আন্দোলনে অংশ নেবে না। গড়ার কাজে তারাও হাত লাগাতে চায়। যদিও সুবিধাবাদী সিংহমশাই আন্দোলনে তাদের ক্ষেপিয়ে তোলার ত্রুটি করেন নি।" বললেন নাগসাহেব।

টেলিফোনে নাগসাহেবের কাছ থেকে ঐ খবরটা শুনে মন্ত্রী-মশাই ভারী খুশি। হেসে বললেন—"সত্যি খুশি হবার মতো খবর! ওরা কি আপনার কাছে এসে জানিয়েছে, ওরা কিভাবে গড়ার কাজ করতে চায় ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ! ছোকরার দল চাইছে একটা ক্লাব আর কো-অপারেটিভ সোসাইটি গড়ে তুলতে।" জবাব দিলেন নাগসাহেব।

"চমৎকার আইডিয়া! কিন্তু কথা হচ্ছে ঐ ছোকরার দলকে ঠিকপথে চালিয়ে নেওয়ার মতো সৎ এবং নিষ্ঠাবান তেমন নেতা ওদের দলে কাউকে দেখেছেন কি ?" প্রশ্ন করলেন মন্ত্রীমশাই।

"আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার! সতীশ, রামলাল, আর শঙ্কর—যারা ছিল সিংহ মশায়ের সব আন্দোলনের পাণ্ডা; তারা তিনজনেই অনুতপ্ত

এখন। নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে দল ছেড়েছে। ওদের কথাতেই ছোকরারা উঠতো বসতো। ওরাই এখন ছোকরাদের গঠনমূলক কাজে লাগবার জন্যে তাগিদ দিচ্ছে, চালাচ্ছে।"

"বেশ কথা! তা'হলে এক কাজ করুন, আপনি ওদেরও বলে দিন যে, সমস্ত যুবক আর ছোকরারা যদি ওদের তিনজনের নেতৃত্বে এক হয়, আর যদি ঐ ছোটদের মতোই নিজেদের ক্লাব আর কো-অপারেটিভের বাড়িটা খেটেখুটে গড়ে নিতে রাজি থাকে, তা'হলে মালমশলা আর টাকা যা লাগে, সেটা আমি উদ্বাস্তু-দপ্তর থেকেই পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবো। কি বলেন, এতে ওরা নিশ্চয়ই খুশি হবে?" প্রশ্ন করলেন মন্ত্রীমশাই ফোনে মুখ রেখেই।

নাগসাহেব বললেন—"নিশ্চয়ই খুশি হবে! খবরটা আমি এখুনি ওদের জানাচ্ছি স্যার।"

মন্ত্রীমশাইয়ের সঙ্গে টেলিফোনের কথা শেষ করে নাগসাহেব ঘরে থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মন্ত্রীমশাই সকলকে খুশি করার কাজে সফল হচ্ছেন ভেবে— টেলিফোনটা নামিয়ে রাখলেন। হাসতে হাসতে পা বাড়ালেন— বাড়ির ভিতরে।

অফিস-ঘরের পর্দা ঠেলে বারান্দায় পা দিতে মন্ত্রীমশায়ের কানে এলো তাঁর স্ত্রী মায়াদেবীর চড়া কথাগুলো কড়া সুরেই।

"সকলকে খুশি করা তোমার সাহেবের কর্ম নয়। তা কী করে সম্ভব! ওটা ওঁর পাগলামি!" বললেন, মন্ত্রী-গিন্নী মায়াদেবী। রোদে পিঠ দিয়ে চুল শুকোচ্ছিলেন তিনি।

রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে পাঁড়েজী বললে—"হাঁপনি অমুন কথা কেন বলছেন মাঈজী?"

"বলবো না? একেশোবার বলবো।" বলেই মায়াদেবী চাপা কান্নার ঝড়ে কেঁদে ফেললেন। কান্নামাখা অভিমানের আবেগে বললেন—"তোমার সাহেব খুঁজে এনে দিতে পারলেন না আজও আমার ছেলে আর শাশুড়ীকে! পারলেন কি তোমার লখিয়াকে এনে দিতে?"

"কিন্তু মাঈজী, সাহেবের চেষ্টায় হররোজ কত্তো মা-বাপের হারানো বেটা বিটির পাত্তা চলছে। মা-বাপকা সাথ মিলছে ভি তারা। হাঁপনি কি সুখী হচ্ছে না মাঈজী?" প্রশ্ন করলে পাঁড়েজী। শান্ত গম্ভীর সান্ত্বনার সুরে।

"না, না! আমি সুখী হবো না ততদিন, যতদিন না আমার ছেলে আর শাশুড়ীর খোঁজ পাই", বলেই কেঁদে উঠলেন মায়াদেবী। মায়ার কান্নায় রাগের গর্জন শোনা গেল।

আড়াল থেকে এসব শুনে নরেন চৌধুরীর বুকটা কেঁপে উঠলো। অন্তরটা তাঁরও কেঁদে উঠলো—ব্যর্থতার বেদনায়। পর্দা ঠেলে আবার তিনি তাঁর অফিস-ঘরে ঢুকে গেলেন।

ছাব্বিশ

রূপনগরে আসার পর উদ্বাস্তুরা আশা-আনন্দ ফিরে পেয়েছে। পেয়েছে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য; অনেকেই অনেক কিছু। কিন্তু লখু যেটা চায়, রোজ যেটা মনে পড়ে, সেটাতো সে পায় নি। দাদাভাই, ঠাকুরমা ভুলেও তার কথা তোলে না। মেতে আছে দিনরাত ওরা কাজের কথায়। নাগসাহেবও কথা দিয়ে কথা রাখেন নি।

লখুর মেজাজই তাই ক'দিন যেন বেশ তিরিখ্যি। স্কুলে যায় না, খেলা করে না! কী যেন হয়েছে ওর।

এই সব খবর পেয়েই নাগসাহেব সেদিন কতকগুলো খেলনা পুতুল হাতে নিয়ে লখুকে খুশি করতে এসেছিলেন। বোঝাতে এসেছিলেন লখুকে, ইস্কুলে যাওয়ার কথা।

মুখ বুজে থাকলে কি হয়, সবই বোঝে ওরা। সব ভারই বইতে পারে ছোটরা। তবে বড়রা বোঝানোর বোঝাটা ঘাড়ে চাপাতে গেলেই ছোটরা কেমন যেন বেশী অবুঝ হয়ে ওঠে।

লখুও তাই ক্ষেপে গেলো, নাগসাহেব ইস্কুলে যাওয়ার কথা বলতেই! কোলের বেরালছানাক'টাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

মাথার ঝাঁকড়ানো কোঁকড়া চুল ঝাঁকিয়ে অভিমানে ভারী গলায় বললে—"না! না! আমি ইস্কুলে যাবো না, খেলতে যাবো না, কোথাও যাবো না। যতক্ষণ না আমার মাকে তুমি খুঁজে এনে দেবে।" লখুর চিৎকারে বেরালছানা ক'টার মা ভয় পেয়ে ছুটে এলো। কাছে গেলো তার বাচ্চা ক'টার।

নাগসাহেবও সাইকেলটা রোয়াকের পাশে রেখে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন লখুর কাছাকাছি। বললেন—"রাগ করিস না মা, আমি কী করি বল? তোর মা যে আসতেই চায় না?"

"নিশ্চয়ই চায়! মিনিটা বলে ওর ছানাগুলো ছেড়ে থাকে না একদণ্ড! আমার মা-ও নিশ্চয়ই আমার কাছে আসতে চায়। ওদের মায়ের মতোই ভালবাসে।" বললে লখু বেরালছানা আর তাদের মা, মেনী বেরালটার দিকে আঙুল দেখিয়ে।

নাগসাহেব আরও বিচলিত হয়ে প্রশ্ন করলেন—"এতই যদি

জানিস না, তবে মায়ের জন্যে এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? নিশ্চয়ই তিনি একদিন আসবেন।"

"বারে! এখুনি কেন আসবে না! ঠাকুরমা দাদাভাই সবাই কাজে ব্যস্ত। আমার সঙ্গে গল্প করার, কথা বলার সময় নেই ওদের। একলাটি আমার ভাল লাগে না যে।" বলেই লখু ফুঁপিয়ে উঠলো। রাগে অভিমানে ফুলতে ফুলতে ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

নাগসাহেব ব্যস্ত হয়ে হাত বাড়ালেন। বললেন—"রাগ করিস না লখু, আয়, আমার কোলে আয়।"

"না! তোমার কথার ঠিক নেই। যাবো না তোমার কাছে। তোমার সঙ্গে আমার আড়ি।" বলেই লখু উড়ন্ত পাখির মতো ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকলো। ঘরে ঢুকেই নাগসাহেবের মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করে, ভেতর থেকে খিল তুলে দিলে।

নাগসাহেব ছুটে গিয়ে রোয়াকে উঠলেন। দরজায় ধাক্কা মেরে বললেন—"লখু সোনা, দরজাটা খোল মা!"

ভেতর থেকে কোনও জবাব এলো না। দুষ্টু লখু দরজাটা বন্ধ করে ফেলেছে ততক্ষণে।

মন্ত্রী নরেন চৌধুরী তাঁর বাড়ির বৈঠকখানার ঘরের বন্ধ দরজায় ঘা দিচ্ছেন আর বলছেন—"মায়া! মায়া! দরজাটা খোলো! চলো! চলো আমার সঙ্গে রূপনগরে। আমি যে ওদের কথা দিয়েছি।"

ভিতর থেকে জবাব এলো—"আমাকে বিরক্ত করো না। আমার ওসব ভালো লাগে না। তুমি একলাই যাও।"

"বেশ, তা'হলে আমিও যাবো না", মন্ত্রী নরেনবাবু বললেন, ভুরু কুঁচকিয়ে হতাশ হয়ে। হাত-ঘড়িটার ওপর চোখ বুলিয়ে চোখ তুলতেই, দেখলেন—সামনেই পাঁড়েজী। জরীর পাগড়ী লাগিয়ে চাপরাশ পরে তৈরি সে। পাঁড়েজীকে হুকুম দিলেন—"গাড়ি গ্যারেজে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলো। আমার শরীরটা ভাল ঠেকছে না।"

পাঁড়েজীর শরীরটা ভাল থাকলেও মনটা খারাপ হয়ে গেল সায়েবের কথা শুনে। "জী হুজুর।" বলেই গুটি গুটি পা বাড়ালে সে দরজার দিকে।

ক'দিন আগে যেখানে ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল ছিল, সেখানেই আজ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে রূপনগরের অগুন্‌তি নওজোয়ান। মস্ত একটা বাড়ি তৈরির কাজে।

মালকোঁচা মেরে হাফ্‌ প্যান্ট পরে, কেউ ওরা ইট গাঁথছে, কেউ ভারা বেয়ে বয়ে আনছে চুন সুরকী মালমশলা। ওদের মধ্যে যারা একটু ষণ্ডা-গুণ্ডা, তারা সবাই দল বেঁধে কপিকলে মোটা কাছি লাগিয়ে টানছে। একটা মস্ত লোহার কড়ি টেনে তুলছে। শব্দ হচ্ছে "হেঁইয়ো জোয়ান! হেঁইও হো।" জমিটার সামনেই একটা কাঠের সাইন-বোর্ডে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে—"রূপনগর নওজোয়ান সঙ্ঘ ও সমবায় সমিতি"।

ওখান থেকে আরও খানিকটা দূরে। রূপনগরের 'শিশু ভবনে'র নতুন-গড়া বাড়িটা ঝক্‌ঝক্ করছে সকালের সোনা রোদে।

বারান্দায় ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল সবাই রঙ কালি মেখে জানলা-দরজা রঙ করার কাজে ব্যস্ত।

বুড়ো ঠাকুরদার দল, ব্যস্ত ওদিকে—'শিশু ভবনে'র ভেতরের নাটমঞ্চটাকে নিয়ে। কেউ র‍্যাঁদা দিয়ে কাঠ চাঁচছে, কেউ রঙ দিয়ে ছবি আঁকছে নাটমঞ্চের সিনগুলোতে। ঠাকুরমা আর মায়ের দলকেও ছেলেমেয়েগুলো টেনে এনে লাগিয়ে দিয়েছে—ওদের 'শিশু ভবনে'র লাইব্রেরির আলমারিগুলোতে বই গুছোনোর কাজে। বুড়ির দল পান-দোক্তা চিবুতে চিবুতে নতুন বইয়ের বাণ্ডিলগুলো খুলে—রঙচঙে বইগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছেন। খাতায় লিখছেন বইয়ের নামগুলো। 'শিশু ভবনে' এসে ছোটদের রঙ-চঙে বইয়ের মলাটের রঙে ওঁরাও বয়স ভুলে যেন সবাই রঙিন হয়ে উঠেছেন। শিশুর মতো আনন্দ কলরবে লাইব্রেরি ঘরটাকে ভরিয়ে তুলেছেন।

'শিশু ভবনে'র বাড়ির বাইরে। ফটকের সামনে কতকগুলি খুব ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আর কয়েকজন খুব বৃদ্ধ প্রবীণ লোক মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে নাগসাহেবের সঙ্গে অপেক্ষা করছেন। ডুখু আর বুদ্ধু ও ওঁদের সঙ্গেই রয়েছে। চঞ্চলতা ওদের চোখে মুখে।

নাগসাহেব বার বার দেখছেন। এদিকে তাকাচ্ছেন, ওদিকে তাকাচ্ছেন। মন্ত্রীমশায়ের আসার সময় পেরিয়ে গেছে, তাই তাঁর অতো অস্বস্তি। শেষ-মেশ হতাশ হয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন তিনি। বললেন—"নিশ্চয়ই উনি কোনও জরুরী কাজে আটকে পড়েছেন, আজ হয় তো আর আসতেই পারবেন না।"

বুদ্ধু গম্ভীরভাবে বললে—“আজ যদি তিনি না আসেন, সবাই খুব হতাশ হয়ে পড়বে স্যার!

সকলের দিকে তাকিয়ে দুখু বললে—“হতাশ হওয়ার কী আছে? তাঁর তো অনেক কাজ? চলুন আমরা সবাইকে বলি গিয়ে, সেই কথাটাই।” মিষ্টি একটা হাসি হেসে বুদ্ধুর কানে মুখ রেখে বললে—“আশায় আশায় থাকাটাতেই বেশী আনন্দ ভাই।”

নাগসাহেব ঘাড় নেড়ে এগিয়ে গেলেন ‘শিশু ভবনে’র দরজার দিকে। আর সকলেই তাঁর পিছু নিলে।

সাতাশ

আশায় আশায় থাকতে পারলেই আনন্দ। ভুলেও থাকা যায় দুঃখ, জ্বালা অনেকখানি। আশা ছেড়ে নিরাশাকে আঁকড়ে যারা ধরে, মস্ত ভুল করে তারা। কোনও লাভ নেই তাতে। ওতে মন-মেজাজ দুই-ই বেগড়ায়। অকারণে চোখের জল গড়ায়, রাগের আগুন দেহে-মনে ছড়ায়, অভিমানও বাড়ে।

লখু এসব কথা বুঝতে পেরেছে। নাগসাহেব ক’দিন ধরে সব কথা বুঝিয়ে দেওয়ার পরে। আশাটা যেন বড় বেশী বেড়ে গেছে ক’দিনেই। ছেলেমানুষের মন, আশা-নিরাশা যখন যেটা ধরে, সেটা নিয়েই তখন বাড়াবাড়ি করে।

সেদিন সন্ধেবেলা। চাঁদের আলো-মোড়া বারান্দায় বসে, বেরালছানাক’টাকে কোলে নিয়ে, লখু খুব বড় করে ভাবছিল তার সেই আশার কথাটাই। শোনাচ্ছিল পাশের বাড়ির মেয়ে ফুলকুমারীকে ওর রঙিন কল্পনা, আশা-আকাঙ্খার কথা।

লখুর কথা শুনে, ফুলু মনে মনে খুব হাসছিল। কিন্তু বেশিক্ষণ আর চুপ করে থাকতে পারলে না সে। বললে—"লখু, তোর আশাটা যেন বড্ড বেশী মনে হচ্ছে। এতদিন পরে কী করে ভাবছিস্ তুই, তোর মা আবার ফিরে আসবে? মানুষের মরাবাঁচার কথা তো বলা যায় না!"

লখু হেসে জবাব দিলে—"ধ্যেৎ। আমার মা বুঝি মানুষ, যে মরে যাবে? ঠাকুরমা বলেছে, আমার মা—লক্ষ্মী-ঠাকরুণ। আর আমি হচ্ছি লক্ষ্মীর প্যাঁচা।"

"তাই নাকি! তবে তো ভাবনার কিছু নেই। তা' এক কাজ কর-না তা'হলে?" বললে ফুলকুমারী। কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বেশ একটু দুষ্টুমীর হাসি হেসে।

লখু ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলে—"কী! কী! বল না?"

"কী জানিস! 'শিশু ভবন' উদ্বোধনের দিন, আমরা মেয়েরা "লক্ষ্মীবন্দনা" বলে একটা থিয়েটার করবো, তুই তাতে প্যাঁচার পার্টটা নিবি?" ফুলু বললে, দুষ্টুমী-ভরা ভারিক্কী চালে।

লখু আনন্দে একেবারে লাফিয়ে উঠলো। বললে—"নিশ্চয়ই নেবো, তবে কিন্তু আমি ফুলুদি, উড়তে জানি না। আমাকে ভাই উড়তে শিখিয়ে দিতে হবে।"

ফুলকুমারী খিল খিল করে হেসে জবাব দিলে—"থিয়েটারের প্যাঁচাকে উড়তে হয় না রে, নাচতে হয়। আমরা তোকে নাচ আর গান শিখিয়ে নেবো। তাতেই দেখবি মা-লক্ষ্মী বেজায় খুশি হয়ে যাবেন।"

লখুর যেন তর সয় না। সে রীতিমতো চঞ্চল হয়ে উঠলো।

"মা-লক্ষ্মীকে খুশি করতেই তো চাই। এখানেই তুমি আমাকে নাচটা শিখিয়ে দাও না ফুলুদি ?"

লখুর পাগলামীর চোটে ফুলু রীতিমতো বিব্রত হয়ে পড়লো। লখুকে থামাবার জন্যে বললে—"এখানে কি নাচ হয় ? কাল থেকে তোকে রিহার্সালে যেতে হবে, পারবি তো ?"

কোলের বেরালছানাগুলোকে ঠেলে ফেলে দিলে লখু। লাফিয়ে উঠে ফুলুকে জড়িয়ে ধরলে। আবদারের সুরে বললে—"কাল কেন ? চলো না আমরা এখ্যুনি রিহার্সালে যাই !"

ঠিক সেই মুহূর্তে, দূর থেকে কে যেন চেঁচিয়ে ডাকলে—"ফুলু, ওরে অ-ফুলি ! কোন্ চুলোয় গেলি !"

"যাই মা ! যাই !" বলেই ফুলকুমারী লখুর হাত ছাড়িয়ে বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়লো। দৌড়লো ওদের বাড়ির দিকে।

লখুও তড়াক করে লাফিয়ে নেমে পড়লো বারান্দা থেকে ; কিন্তু এগুতে আর ভরসা হলো না। ফুলুদিদির মায়ের রাগী-রাগী চেহারাটা ভেসে উঠলো ওর চোখের সামনে। ফুলুদিদির মা যেন কালীমা ! বড্ড রাগী মানুষ। কথায় কথায় রাগ করে, বকে। তাই সে আর ফুলুদিদিদের বাড়ির দিকে পা-বাড়ালো না। ভাবলে, ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই। ফুলুদিদির সঙ্গে কাল থেকেই সে রিহার্সালে যাবে।

উঠে এসে বসলো আবার বারান্দায়। বেরালছানাগুলোকে টেনে টেনে কোলে তুলে নিলে লখু। নতুন আশা-আনন্দের দোলনায় মন তার দুলতে শুরু করেছে তখন পুরোদমে। স্বপ্নের দোল খেতে খেতে লখুও দোলা দিতে লাগলো বেরালছানাগুলোকে

কোলের ওপর রেখে। বেরালছানাগুলো ঘুমিয়ে পড়ার আগে লখু নিজেই ঘুমে ঢলে শুয়ে পড়লো, চাঁদের আলোর চাদর-মোড়া বারান্দার কোলে।

স্বপ্ন এসে হাত ধরে লখুকে নিয়ে গেল অনেক দূরে। স্বপ্নের মধ্যেই সে নেচে গেয়ে লক্ষ্মীঠাকুরকে খুশি করে একেবারে লক্ষ্মী-মায়ের কোলে চড়ে বসলো যখন, তখন হুঁশ হলো—ঠাকুরমা আর দাদাভাই দু'জনে মিলে ডাকাডাকি করছে। ঘুম ভেঙে গেল। লখু কান্না জুড়ে দিলে। ঠাকুরমা আর দুখু দু'জনে ওকে ধমকে বকে ঘরে নিয়ে গেলেন।

রাগ করে বায়না নিয়ে, সেদিন রাত্রে লখু কিচ্ছু খেলে না। বিছানায় গিয়ে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লো—আবার লক্ষ্মীমায়ের কোলে-চড়ার স্বপ্ন চোখে নিয়েই।

পরের দিন সকাল থেকেই ফুলকুমারীর সঙ্গ নিলে লখু। ছায়ার মতো ঘুরে বেড়ালো তার সঙ্গে সঙ্গে। ফুলুও তাকে রিহার্সালে না নিয়ে গিয়ে পারলে না।

রিহার্সালে গিয়ে লখুর মহা ফুর্তি। প্যাঁচার নাচ-গানে সে প্রথম দিনেই এমন কেরামতি দেখিয়ে দিলে যে সবাই অবাক! তাক লেগে গেল সক্কলেরই। সক্কলে বললে—"লখুই এবার অভিনয়ে সবাইকে টেক্কা দেবে।"

প্রথম দিন রিহার্সাল থেকে ফিরে এসে লখু খুব গম্ভীর হয়ে রইলো। দাদাভাই আর ঠাকুরমা যখন 'শিশু ভবনে'র কাজ সেরে রাত ক'রে বাড়ি ফিরলো, তখন তাদের কাউকেই থিয়েটারের কথা কিছু বললে না লখু। মনে মনে তার দুষ্টুমি মতলব।

দাদাভাই আর ঠাকুরমাকে থিয়েটারের দিন একেবারে অবাক করে দেবে। তার আগে কিছুই বলবে না।

ঠাকুরমা আর দাদাভাই, দু'জনের কেউ কিছুই টের পেল না। ওঁরা দু'জনে রোজ বিকেলে যখন 'শিশু ভবনে'র কাজে যায়, তখনই লখু রিহার্সাল দিতে পালায়। ওঁরা ফেরবার আগেই, বাড়িতে এসে লখু পড়তে বসে ভাল-মানুষটির মতো। এমনি করেই চললো লখুর ঘরে-বাইরে নতুন অভিনয়ের মহলা।

আঠাশ

রাতের কালো মশারি ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে ভোরাই আলো। রাঙা-মুখ সূর্যিমামা হামা দিয়ে উঠছেন আকাশের গায়ে। গুটি গুটি এগুচ্ছেন ওপরে আরও ওপরে।

একটু দূরে, বড় রাস্তা ধরে চলেছে ছেলেমেয়ের দল। নতুন ইউনিফর্ম পরে। তালে তালে পা ফেলে মার্চ করে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের ছোটবড় দল মাঝে মাঝে ব্যাণ্ড বাজিয়ে চলেছে, ওদের পায়ের তালে তাল মিলিয়ে।

লখু অবাক হয়ে দেখছিল এসব, ওর ঠাকুরমার পাশে দাঁড়িয়ে। ছেলেমেয়ের দল যখন বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল, ব্যাণ্ডের বাদ্যি যখন দূরে গেল, তখন বেশ যেন অবাক হয়েই লখু প্রশ্ন করলে—"ঠাকুরমা! এসব কী গো?"

"পোলাপানগুলান তাগো শেষ মহড়া দিতে আছে।" জবাব দিলেন ঠাকুরমা-বুড়ি।

লখু বেশ বিরক্তি আর বিস্ময় নিয়ে বললে—"ওঃ! কিন্তু

দাদাভাই আমাকে এসব কথা বলে নি কেন? নিয়ে গেল না কেন আমায় সঙ্গে করে?"

"কেন তরে কইবো, কেন তরে লইয়া যাইবো সে? তুইও তো তার লগে কয়দিন কথাই কস নাই! দোষ তো তরই।" গোঁজ গোঁজ করতে করতে জবাব দিলেন ঠাকুরমা।

"আচ্ছা বেশ! আমিও তোমাদের দু'জনের কাউকেই নাচ দেখাতে নিয়ে যাবো না।" বললে লখু, অভিমানের সঙ্গে রাগের ঝাঁঝ মিশিয়ে।

ঠাকুরমা চমকে উঠলেন। মুখ ঘুরিয়ে হেসে বললেন—"হায়রে আমার পোড়া কপাল! প্যাঁচায় আবার নাচবো কিসের লাইগ্যা!"

লখুও মুখ বেঁকিয়ে বললে—"মা-লক্ষ্মী আসবে বলেই নাচবো। বলবো না আর কিচ্ছু তোমাকে।" বলেই লখু বারান্দা থেকে ছুটে নেমে গেল। দৌড়লো সেই ছেলেমেয়ের দলের দিকে।

ঠাকুরমা-বুড়ি হেসে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

'রূপনগর নওজোয়ান সঙ্ঘ ও সমবায় সমিতি'র নতুন বাড়ি তৈরির কাজ সবে শেষ হয়েছে। ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে সেই নতুন বাড়িটাকে ঘিরে বিরাট ব্যস্ততার সাড়া। বাড়িটার সামনে নানাজনে নানা কাজে ব্যস্ত।

সতীশ তদারক করছিল ফটক সাজানোর ব্যাপারটা। শঙ্কর তখনও কয়েকজন যুবককে সঙ্গে নিয়ে সাফ করছিল ফটকের সামনের রাস্তাটা। সঙ্ঘ-বাড়ির সামনের নতুন করে গড়ে তোলা ফুলবাগানের বেড়া বাঁধার কাজটা চটপট সেরে ফেলার জন্যে,

তাড়া লাগাচ্ছিল রামলাল সবাইকে। বাড়িটার ভেতর থেকে ভেসে আসছিল হালকা একটা কনসার্টের সুর।

সঙ্ঘ-বাড়ির ভেতরেও আরও হাজার ব্যস্ততা। ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি। ভেতরের হলঘরে মঞ্চের ওপরে একদল যুবক রকমারী বাজনায় সঙ্গীত করছিল। বারবার মহড়া দিচ্ছিল, বিকেলের অনুষ্ঠানে যে সুরটা ওরা বাজাবে সেটাই। সুপারিন্টেন্ডেন্ট নাগসাহেব আরও কয়েকজন মুরুব্বিকে সঙ্গে নিয়ে খুব মন দিয়ে শুনছিলেন ওদের বাজনার মহড়া। হঠাৎ তাঁর নজর পড়লো দেওয়ালে বড় ঘড়িটার দিকে। দুটো বাজতে মাত্র দু'মিনিট বাকি।

কাঁটায় কাঁটায় দুটো বাজলো। কনসার্টও থামলো। নাগসাহেব হাততালি দিয়ে বললেন—"চমৎকার! আর মহড়ার দরকার হবে না। এবার আপনারা বাড়ি যান। চটপট নাওয়া-খাওয়া সেরে তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন।"

একজন যুবক জিজ্ঞেস করলে—"মন্ত্রীমশাই ঠিক কখন এসে পৌঁছবেন স্যার?"

"কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটার সময়। প্রথমেই আপনাদের 'নওজোয়ান সঙ্ঘ' পরিদর্শন করবেন। তারপর ছ'টায় যাবেন 'শিশু ভবনে'র অনুষ্ঠানে। আজ আপনাদের একেবারে ঘড়িঘণ্টার সঙ্গে তাল রেখে চলতে হবে।" বললেন নাগসাহেব হাসতে হাসতে।

সবাই ঘাড় নেড়ে জানালে—"তাই হবে স্যার! ভাববেন না কিছু আপনি।"

দুখু শিশু-বাহিনীর ইউনিফর্ম গায়ে চড়িয়ে, স্কার্ফটা গলায়

বেঁধে জুতোর ফিতে বাঁধছিল, বেশ যেন একটু গম্ভীর মুখেই। অন্যদিনের মতো মাথার চুলগুলো তার আর উস্কোখুস্কো নেই। দিব্যি সিঁথি কেটে চকচকে করে আঁচড়ানো। জামাপ্যান্ট একেবারে কেতাদোরস্ত ইস্তিরী-করা।

দাদাভায়ের এই সাজগোজ দেখছিল লখু মুগ্ধ হয়ে। নাগসাহেব লখুকে যে সুন্দর দামী ফ্রকটা কিনে দিয়েছিলেন, সেটাই লখু আজ পরেছে। মাথায় ফিতে বেঁধে নিয়েছে ফুলুদিদিকে দিয়ে।

দুখু জুতোর ফিতেটা কিছুতেই বেঁধে উঠতে পারছে না দেখে, হাতদুটো পেছনে লুকিয়ে রেখে লখু দুষ্টুমীর হাসি হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো। গেল গুটি গুটি দুখুর সামনে।

ঠাকুরমা সেই ঘরের একধারে, মেঝেতে মাদুর পেতে ঘুমুচ্ছেন তখনও। নাক ডাকাচ্ছেন তাঁর নিজের সেলাই-করা পুরানো একটা কাঁথা মুড়ি দিয়ে। ঠাকুরমার রকম দেখে লখুর রাগও হলো হাসিও পেলো।

হঠাৎ তেমন সময় ঢং-ঢং-ঢং-ঢং করে চারটে ঘণ্টার শব্দ! ভেসে এলো রূপনগরের সুপারিণ্টেডেণ্টের আপিস থেকে। বেলা চারটে বাজলো দেখে, দুখু কোনও রকমে জুতোর ফিতেটা জড়িয়ে-মড়িয়ে বেঁধে নিলে। উঠে দাঁড়ালো উৎসবের কাজে যাওয়ার জন্যে।

লখুও পেছনে হাত লুকিয়ে, ঘুরে গিয়ে তার সামনে দাঁড়ালো। দুষ্টুমি করে ডানহাতে সেলাম করলে। বাঁহাতে এগিয়ে ধরলে সেই নকল গোঁফজোড়ার একটা গোঁফ। হেসে বললে—"লীডার সাহেব। গোঁফটা লাগিয়ে নিন!"

দুখু রাগে গর্জে উঠে ওর হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিলে। বললে—

"এখন মস্করা করার সময় নয়!" বলেই সে রেগে গট্‌মট্‌ করে বেরিয়ে গেল।

দাদাভায়ের ব্যবহারে লখুর মনে বড় ঘা লাগলো। অভিমানে দুঃখে নিজেই নিজের ঠোঁটটা কামড়ালে। কেঁদে ফেললে দাঁতে দাঁত চেপে। রাগের চোটে সে ঘুমন্ত ঠাকুরমাকেই গিয়ে ঠেলতে লাগলো—"ঠাকুরমা! ও ঠাকুরমা! দাদাভাই আমাকে ফেলে চলে গেল। আমাকে নিয়ে গেল না।"

বুড়ি ঠাকুরমার ঘুমটা তখন জমাট ভারী। তাই পাশ ফিরতে ফিরতে ঘুম জড়ানো গলাতেই জবাব দিলেন। "একলাই তো তুই যাইতে পারস—কেডা তরে ধইরা রাখছে?" বলতে বলতেই আবার বুড়ি কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুলো।

ঠাকুরমার কাণ্ড দেখে লখু একেবারে তিড়বিড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো। রাগের চোটে কাঁপিতে কাঁপতে কী যেন ভাবলে, তারপর জিজ্ঞেস করলে,—"তুমি যাবে না আমার নাচ দেখতে?"

"না বাছা, আমার অতো শক্তিও নাই, শখও নাই। আমি একেবারে আইল্যা পরছি, আমারে ঘুমাইতে দে।" বলেই ঠাকুরমা আবার চিৎ হয়ে শুলেন। সঙ্গে সঙ্গে অমনি শুরু হলো আবার সেই নাক-ডাকানো।

লখু কী করে আর সেখানে দাঁড়ায়। এমনিতেই তার দেরি হয়ে গেছে, তার ওপর এই অপমান আর অবহেলা! বেচারা তাই মন ভারী করে দুম্‌দুম্‌ করে পা ফেলে, ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল। ছুটলো 'শিশু ভবনে'র উৎসবে।

উনত্রিশ

কাঁটায় কাঁটায় ঠিক পাঁচটা। নতুন উদ্বাস্তু-মন্ত্রী সস্ত্রীক এসে পৌঁছলেন। ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে আসমানী রঙের মস্ত একটা মোটরে চড়ে। ওঁরা পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে একটা উল্লাসের সাড়া পড়ে গেল।

'রূপনগর নও-জোয়ান সঙ্ঘে'র নতুন বাড়িটার সাজানো-গোছানো ফটকটার সামনে মন্ত্রী নরেন চৌধুরী আর তার স্ত্রী মায়া-দেবীকে সম্বর্ধনা জানিয়ে নামিয়ে নিলেন নাগসাহেব আর রূপ-নগরের প্রবীণ প্রাচীনরা। মেয়েরা শাঁখ বাজিয়ে উলু দিলেন। স্বাগত জানালেন সম্মানিত অতিথি দু'জনকে।

একটি ফুট্‌ফুটে ছোট্ট মেয়ে মন্ত্রী আর মন্ত্রীর স্ত্রীর গলায় মালা পরিয়ে দিলে। আগে থেকে ফটোগ্রাফাররা তৈরিই ছিল। চোখ-ঝলসানো ঝিলিক দিয়ে তাদের ক্যামেরায় ফ্লাশ বাল্‌ব্‌গুলো পটাপট জ্বললো, নিভলো। খবরের কাগজের রিপোর্টার আর স্থানীয় সংবাদদাতাদের দলের ঠেলাঠেলি শুরু হলো। মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে।

নাগসাহেবই মন্ত্রী আর মন্ত্রীগিন্নীকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। 'নওজোয়ান সঙ্ঘে'র নতুন বাড়ির ফিতে-বাঁধা সদর দরজার সামনে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে রূপোর একটা কাঁচি দিয়ে লাল ফিতেটা কাটলেন মন্ত্রীমহাশয়। সঙ্ঘের দ্বারোদ্‌ঘাটন ঘোষণা করলে বড় বড় মেয়েরাই শাঁখ বাজিয়ে।

মন্ত্রীমহাশয়ের পিছু পিছু পিল পিল করে লোক ঢুকলো। সঙ্ঘের নতুন বাড়ির ভেতরকার ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত দেখতে।

ওদিকে, 'শিশু ভবনে'র সামনে। ফটকের দু'পাশে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, ইউনিফর্মপরা শিশুবাহিনীর ছেলেমেয়েরা। মন্ত্রী-দম্পতিকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে তৈরি হয়ে।

'নওজোয়ান সঙ্ঘে'র উদ্বোধন-অনুষ্ঠান শেষ হলো। বক্তৃতা দিয়ে, সেখানকার সব কাজ শেষ করে, ঠিক ছ'টাতেই পেঁছিলেন মন্ত্রীমশাই আর তাঁর স্ত্রী, 'শিশু ভবনে'র ফটকে। শিশু-বাহিনীর ছেলেমেয়েরা দু'দিকের দু'-সারিতে দাঁড়িয়ে সামরিক অভিবাদন জানালে। তারপর সবাই মন্ত্রীমশাই আর তাঁর স্ত্রীকে মাঝখানে রেখে এগিয়ে চললো। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাই ব্যাণ্ড বাজিয়ে আগে আগে চলেছে পথ দেখিয়ে।

এসব দেখে, মন্ত্রীমশাই আর মন্ত্রীগিন্নী বেজায় খুশি। ছেলেমেয়েদের খুশিভরা মুখগুলোর আলোয় ওঁদের দু'জনের মুখেও আশা-আনন্দ ঝলসে উঠলো।

প্রথমেই ওঁদের নিয়ে যাওয়া হলো, 'শিশু ভবনে'র শিশু-শিল্প প্রদর্শনীতে। রূপনগরের ছোটদের হাতের তৈরি রকমারি জিনিস আর ছবি দিয়ে সাজানো এই প্রদর্শনীটা সত্যিই অদ্ভুত করে গোছানো! ছোটরা নিজেরাই নাকি সাজিয়েছে, গুছিয়েছে।

মন্ত্রী নরেন চৌধুরীমশায় আর তাঁর স্ত্রী, ঘুরে ঘুরে নেড়ে চেড়ে যত্ন করে দেখছিলেন প্রদর্শনীর প্রতিটি জিনিস। যতই দেখছেন ততই অবাক হচ্ছেন। উথলে পড়ছে ঠোঁটের ফাঁকে হাসি। চোখের চাউনিতে অপার বিস্ময়।

দেখতে দেখতে মন্ত্রীমশাই হঠাৎ বলে ফেললেন—“বিশ্বাস করা শক্ত যে, এমন সব সুন্দর সুন্দর জিনিসও ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা তৈরি করতে পারে!”

“নিজের চোখে না দেখলে আমারও বিশ্বাস হতো না স্যার। কিন্তু দেখলাম, একটু উৎসাহ আর সাহায্য পেলে, ওরা তাক-লাগানো সব সৃষ্টি করতে পারে।” বললেন নাগসাহেব।

“ঠিক বলেছেন। এসব কাজে উৎসাহ আর সহযোগিতা পায় না বলেই ওদের প্রতিভা ও সৃষ্টি-ক্ষমতার বিকাশ ঘটে না।” জবাব দিলেন মন্ত্রী-গৃহিণী মায়াদেবী।

প্রদর্শনীর সমস্ত বিভাগ ঘুরে দেখে, ঢুকলেন ওঁরা ‘শিশু ভবনে’র নাট-ঘরে। মঞ্চে বসিয়ে ওঁদের দু'জনকেই মালা-চন্দন পরালে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। সমবেত সঙ্গীতের পর, সকলকে স্বাগত জানালে বুদ্ধু, সুন্দর একটি বক্তৃতা দিয়ে। মন্ত্রীমশায়ের সহজ ছোট্ট একটি বক্তৃতা দেওয়ার পরই শুরু হলো ‘লক্ষ্মী-বন্দনা’ অভিনয়। মন্ত্রীমশাই আর মন্ত্রী-গৃহিণী মঞ্চ থেকে নেমে এসে বসলেন সামনের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মাঝখানে। দু'খানা হাতল-ওয়ালা বড় চেয়ারে।

অভিনয় শুরু হয়ে গেছে। নতুন ধরনের নৃত্যনাট্য ‘লক্ষ্মী-বন্দনা’। জমে উঠেছে নাচে-গানে। ছোটর দলই নাচছে, মূক-অভিনয় করছে। একটু যারা বড় তারাই পেছনে বসে রকমারী বাজনা বাজাচ্ছে। একেবারে ওস্তাদী দক্ষতায়।

ক্ষুদে অভিনেতাদের অঙ্গভঙ্গীর ব্যাখ্যা করে আড়াল থেকে মিষ্টি গলায় বলে চলেছে—কি হচ্ছে কি ঘটছে। অবাক হয়ে চুপটি করে ছোটো বড়ো সবাই দেখছে শুনছে তাই।

লক্ষ্মী-ঠাকরুণ তাঁর বাহন পেঁচাটিকে খুঁজে পাচ্ছেন না। তাই তিনি কান্নাকাটি করছেন। নারায়ণ তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন এই বলে যে, দেবীর বাহনটিকে খুঁজতে পাঠিয়েছেন নারদকে।

নারদ নাচতে নাচতে ঢুকলেন, বীণা বাজিয়ে লক্ষ্মীকে বললেন—"আসুন আমার সঙ্গে, আপনার পেঁচার খোঁজ পাওয়া গেছে।" সঙ্গে সঙ্গে পর্দা পড়ে গেল। হাততালি দিয়ে ছোট বড়ো সবাই তারিফ জানালে।"

পরের দৃশ্যে দেখা গেল ঃ নাদা-পেটা গণেশদাদা শুঁড় ছুলিয়ে নাচছেন। আর পেঁচাটার চার পাশে ঘুরতে ঘুরতে পেঁচাকে বাঁধছেন একটা মোটা কাছি পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে। গণেশদাদার ইঁদুরের মহাফুর্তি। সে নাচ জুড়ে দিয়েছে ল্যাজ উঁচিয়ে, কান নাড়িয়ে।

তেমন সময়, লক্ষ্মী এসে ঢুকলেন সেখানে নারদের সঙ্গে। ঠাকরুণ চটে মটে হাত পা নেড়ে চোখ নাচিয়ে তাঁর গণেশদাদাকে জিজ্ঞেস করলেন—"কোন্ অধিকাবে তার বোনের বাহন পেঁচাকে অমন করে সাজা দিচ্ছেন!"

গণেশদাদাও ভুঁড়ি ছুলিয়ে শুঁড় তুললেন, অঙ্গভঙ্গী করে জবাব দিলেন—যেহেতু তাঁর বোনের বাহন ঐ পেঁচাটি বড্ড পেটুক। লোভ তার এতোই যে, সে গণেশদাদার ইঁদুরটাকেই তাড়া করেছিল, খেয়ে ফেলতে চেয়েছিল ওটাকে। গণেশদাদা হাত-পা নেড়ে জানিয়ে দিলেন লক্ষ্মী-ঠাকরুণকে—তার পেঁচাটিকে সে কিছুতেই ছাড়বে না তিন দিনের আগে ; এর জন্যে যা খুশি তাই করতে পারেন লক্ষ্মী। দাদার কাণ্ড দেখে বোন লক্ষ্মী-ঠাকরুণও

চটে আগুন। তিনিও একেবারে ক্ষেপে উঠে তাণ্ডব নাচের তাল ঠুকলেন। গাণশদাদাও পাল্টা তালে পা ছুঁড়লেন। শুরু হয়ে গেল লক্ষ্মী আর গণেশের ঝগড়া-লড়াই। একেবারে রণতাণ্ডব। ব্যাপার বেগতিক দেখে, নারদঠাকুর তাঁর বীণা ফেলে দিয়ে দৌড়লেন নারায়ণকে এই দুঃসংবাদ জানাতে। পর্দা আবার পড়ে গেল। শুরু হলো কান-ফাটানো হাসির হররা আর হাততালি।

হলের আলো জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল মন্ত্রী নরেন চৌধুরীমশাইও হাততালি দিতে দিতে মেতে উঠেছেন, আশ-পাশের আনন্দমাতাল ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। মন্ত্রী-গৃহিণী মায়া দেবীও হাসছিলেন, কিন্তু হঠাৎ তাঁর হাসিটা থেমে গেল। চোখ দু'টো তাঁর বিঁধলো গিয়ে আর একজোড়া চোখে।

তিরিশ

হলের ভেতরে দূরে। দুখু ঘুরে ঘুরে অনুষ্ঠানের প্রোগ্রাম বিক্রী করছিল। মন্ত্রী-গৃহিণীর চোখ পড়েছে তার দিকেই। মন্ত্রী-মশাইয়ের সেদিকে চোখ নেই। তিনি গড়িয়ে পড়ছিলেন ছোটদের সঙ্গে হেসে হাততালি দিয়ে। হঠাৎ মায়াদেবী শিউরে উঠে চোখ ফেরালেন। স্বামীর গায়ে ঠেলা মেরে আঙুল দিয়ে দেখালেন দুখুকে। বললেন—"বই বিক্রী করছে যে-ছেলেটি, মনে হচ্ছে আমাদের সুখরঞ্জন।"

মন্ত্রীমশাই আড়চোখে তাকালেন দুখুর দিকে। নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন—"না! না! আমাদের শুকু অমন কালো আর রোগা হতেই পারে না। তুমি ভুল করছো।"

"না গো না, ভুল নয়। বেশ তো ডাকোই-না তুমি ছেলেটিকে একবার? জিজ্ঞেস করো ছেলেটিকে ওর নাম কী?" বললেন মায়াদেবী, বেশ কাতর অনুরোধ জানিয়ে।

কী আর করেন মন্ত্রীমশাই। ইশারা করে ডাকলেন দুখুকে। দুখু কাছে এলো। প্রণাম করলো ওঁদের দুজনকেই। মায়াদেবী হাত ধরে দুখুকে ওঠালেন। লজ্জা ভয়ে দুখু আড়ষ্ট হয়ে হাতটা সরিয়ে নিলে। মায়াদেবী অবাক চোখে চেয়ে রইলেন দুখুর মুখের দিকে।

মন্ত্রীমশাই জিজ্ঞেস করলেন—"খোকা, তোমার নাম কি?"

"আমার নাম দুখু", জবাব দিলে দুখু লজ্জায় মুখ হেঁট করে।

মায়াদেবীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো। নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"তোমাদের সংসারে আর কে কে আছেন বাবা?"

"আমি, আমার ঠাকুরমা, আর আমার ঐ ছোট্ট বোনটি, লক্ষ্মীর পেঁচা হয়ে যে এইমাত্র নাচ দেখালে?" জবাব দিলে দুখু বেশ নরম সুরে মিষ্টি করেই।

মন্ত্রীমশাই ভুরু কুঁচকালেন। কানখাড়া করে শুনলেন দুখুর কথাগুলো। হেসে উঠলেন নিজের মনে মনেই। "তোমার ঠাকুরমা কোথায় বাবা? এসেছেন তিনি এখানে?" আবার জিজ্ঞেস করলেন মায়াদেবী, কাতর কৌতূহল বাড়িয়ে।

দুখু ঘাড় নেড়ে জানালে—"না, বাড়িতেই আছেন।"

দুখুর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন মায়াদেবী। চোখের পাতা পড়লো না তাঁর, ঠোঁট তাঁর নড়লো না। মন্ত্রমুগ্ধের মতো ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন দুখুর দিকে। দুখুরও মন

চাইছিল হাত বাড়িয়ে তাঁর হাতটা ধরতে। চাইছিল দুখু আদর ভালবাসার স্পর্শ পেতে। কিন্তু পারলে না বেচারা। সঙ্কোচ ভয়ে পারলে না তার মনের সাধটুকু মেটাতে।

মন্ত্রীমশাই ব্যাপারটা লক্ষ্য করে বেশ যেন একটু বিরক্তই হলেন। বেশ একটু কঠোরভাবে দুখুকে বললেন—"তুমি এখন যেতে পারো, তোমার কাজ করো গিয়ে।"

দুখু আর এক মুহূর্ত সেখান দাঁড়ালো না। লজ্জায় মুখ লাল করে দৌড়ে পালাল! ভিড়ের মধ্যে প্রোগ্রাম বিক্রী করতে করতে ভাবতে লাগলো, ও কি কোনও অন্যায় আচরণ করেছে, বোকামি দেখিয়েছে! মন তার তোলপাড় এই ভাবনাতেই।

দুখু দূরে সরে যেতেই মন্ত্রীমশাই স্ত্রীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন—"দেখলে তো! আমার কথাই ঠিক হলো।"

দুখুর দিকে চোখ রেখেই মায়াদেবী ধীর গম্ভীর গলায় বললেন—"আমার কিন্তু এখনও সন্দেহ আছে।" তখনও মায়াদেবীর বুকটা তোলপাড় করছে। পুরণো দিনের স্মৃতির দোলায় মন তাঁর দুলছিল তখনও। একটু চুপ করে থেকে আবার তিনি বলে উঠলেন—"চলো না আমরা একবার ওদের বাড়িতে যাই, দেখে আসি ওর ঠাকুরমাকে ?"

"তা কী করে সম্ভব ? লোকে কী বলবে ?" জবাব দিলেন মন্ত্রী নরেন চৌধুরী, মুখখানা কালো করে। সঙ্গে সঙ্গে হলের আলোগুলোও গেল নিভে। পর্দা উঠে শুরু হলো নৃত্যনাট্যের আর এক দৃশ্য। নারায়ণ এলেন লক্ষ্মী আর গণেশের ঝগড়া মেটাতে।

এরপর মায়াদেবী আর কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারলেন

না। চাপা উদ্বেগের অস্থিরতায় তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। বললেন—"শরীরটা আমার কেমন করছে, আমি আর বসতে—পারছি না।"

মন্ত্রী-গৃহিণী উঠে পড়তেই, মন্ত্রীমশাইকেও তাঁর পিছু নিতে হলো। মায়াদেবী এগিয়ে যেতে যেতে, বার বার ফিরে ফিরে তাকাতে লাগলেন দুখুর দিকে। কাতর চোখে তাঁর মায়াভরা মায়ের ডাক।

দূর থেকে সেই ডাকের ইশারা পেয়ে দুখু দৌড়ে এলো। জিজ্ঞেস করলে মায়াদেবীকে—"আপনি আমার বোনের নাচটা দেখবেন না?"

মায়াদেবী হাত বাড়িয়ে দুখুর গলাটা জড়িয়ে ধরে জবাব দিলেন—"না বাবা! আমার শরীরটা কেমন করছে।"

কথাটা শুনে দুখু ব্যস্ত, ব্যাকুল হয়ে পড়লো, বললে—"তা'হলে আমাদের বাড়িতে চলুন না কেন? একটু বিশ্রাম করবেন?"

"হাঁ বাবা! তাই যাবো, নিয়ে চলো।" বলেই দুখুকে জড়িয়ে ধরে পাশে টেনে নিলেন। হন্‌হনিয়ে এগিয়ে চললেন। মন্ত্রী-মশাইকে পিছনে ফেলে রেখে।

মন্ত্রামশাই, তাঁর স্ত্রী আর দুখু হলঘর থেকে বেরিয়ে ফটকের দিকে এগিয়ে চলেছেন। দেখতে পেয়ে নাগসাহেব হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন—"স্যার, আপনি চলে যাচ্ছেন?"

নরেনবাবু জবাব দিলেন ভারী গলায়—"যেতে হচ্ছে, ওঁর শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়লো বলে।" দুখুও নির্ভীক আগ্রহে বলে উঠলো—"তাই আমি ওঁকে আমাদের বাড়িতেই নিয়ে যাচ্ছি, সেখানে বিশ্রাম নিতে চান উনি।"

নাগসাহেব ব্যস্ত হয়ে বললেন—"দাঁড়ান, তা'হলে গাড়িটা ডাকিয়ে নিয়ে আসি।

মায়াদেবী হেসে বললেন—"না! না! আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। আমি হেঁটেই যাবো। খোলা বাতাসে খানিকটা হাঁটলেই আমার শরীর ভাল হয়ে যাবে।" কথাগুলো শুনে মন্ত্রী নরেনবাবু ভুরু দুটো কোঁচকালেন শুধু। বললেন না একটি কথাও আর।

দুখুর ঠাকুরমা সাঁঝের পিদিম জ্বালিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে আহ্নিক করতে বসেছেন। আহ্নিক শেষ হতেই হাঁটু গেড়ে বসে মাটিতে মাথা ঠুকে প্রণাম করলেন। রইলেন খানিকক্ষণ ঐভাবেই, মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে।

দুখু হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকে পড়লো। দৌড়ে এসে লণ্ঠনটা ঘরের মেঝে থেকে তুলে নিয়ে চাপা গলায় বললে—"ঠাকুরমা, দেখবে এসো, আমাদের বাড়িতে কত গণ্যমান্য অতিথি আসছেন।" বলেই সে লণ্ঠনটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, মন্ত্রীমশাই আর তাঁর গৃহিণীকে পথ দেখিয়ে আনতে।

মন্ত্রীমশাই আর তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই দুখুর ঠাকুরমা মাটি থেকে মাথা তুলে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন। খানিকক্ষণ মাননীয় অতিথি দু'টির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে, বুড়ি একেবারে পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠলো—"ওরে আমার মনুরে! ওরে আমার পুতুলরে!" লাফিয়ে উঠলো বুড়ি বাতের ব্যথা-যন্ত্রণা ভুলে। আলুথালু কাপড় বগলে পুরে—কাঁপতে লাগলো থরথর করে।

ঠাকুরমা আবার ক্ষেপে উঠেছে এই মনে করে—দুখুও ঝট্ করে গিয়ে জাপটে ধরলে ঠাকুরমাকে। ফিস্‌ফিস্ করে চাপা

গলায় বললে—"না! না! ঠাকুরমা তুমি জানো না ওঁরা কারা ?"

"জানিরে জানি, তোরে আর চিনাইতে লাগবো না।" বলেই গজরে উঠলো বুড়ি। দুখুকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ছুটলো নরেনবাবু আর মায়াদেবীর দিকে। বিড়বিড় করে বললে বুড়ি—"তুই চিনস না আমার লক্ষ্মী-নারায়ণ রে, মা-বাবারে !"

মন্ত্রী আর মন্ত্রী-গৃহিণীও দু'জনেই জড়িয়ে ধরলেন বুড়িকে। বলে উঠলেন—"মাগো ! মা !"

এসব দেখে-শুনে দুখুরও সব কেমন গোলমাল হয়ে গেলো। লজ্জা ভয় আনন্দ সব মিশিয়ে কী যেন কী একটা হলো। দুখু আর দাঁড়াতে পারলে না সেখানে। সকলের চোখের আড়ালে সে দৌড়ে পালালো ঘর থেকে।

একত্রিশ

সাঁঝের কালো অন্ধকারের বুক চিরে দুখু দৌড়চ্ছে। এবড়ো-খেবড়ো মাঠ ভেঙ্গে। মাটির ঢেলাগুলো গুঁড়িয়ে মাড়িয়ে। বুকের ভেতরটা তোলপাড় তার, অজানা অস্থিরতায়। এতদিন ধরে যে-অস্বস্তি যে-অস্থিরতা দুখুকে পাগল করতো—এ যেন তা নয়। একেবারেই নতুন এটা। 'মা' আর 'বাবা' দুটো কথাই যেন ফিরে ফিরে বারে বারে তার কানে বাজছে। ভুলে-যাওয়া কোন গানের সুরে। সেই সুরে সুর মেলাতে দুখুও কান্না-মেশানো গলায় বার বার বলে চলেছে। "বাবা ! মা ! লখুরে ! মা-বাবা।" ছুটছে দুখু লখুর কাছে, মাঠ পেরিয়ে সোজা রাস্তায়। ওর বুকটা

বড্ড ভারি হয়ে উঠেছে, চোখে জল উপছে পড়েছে। লখুকে সব কথা বলে হাল্‌কা তাকে হতেই হবে।

অনেক দিনের জমাট-বাঁধা চাপা কান্নার বরফ ফোঁপানি কান্নায় জল হয়ে গড়িয়ে পড়ছে মায়াদেবীর দু'গাল বেয়ে। বুড়ি শাশুড়ীর বুকে মাথা রেখে ডুকরে উঠলেন তিনি। বললেন—"মাগো! শুকুর নাম বদলে আপনি দুখু করেছিলেন বলেই এই কয় বছরের চেষ্টাতেও আপনাদের খোঁজ পাই নি আমরা।"

"উপায় ত ছিল না মা! মাথাটা আমার এক্কেবারে বিগরায়ে ছিল। নাম, কাম সব ভুইল্যা খাইছিলাম। মস্ত উলট-পালট মা, মস্ত উলট-পালট। সুখ পালটাইয়া দুঃখে ঘেরছিল। শুকুরে তোমার দুখু কইরা থুইছি যে সেডা আমিই ট্যার পাই নাই।" বললেন দুখুর ঠাকুরমা, কেমন যেন ধীর স্থির হয়ে। বাইরের বটগাছটায় একটা প্যাঁচা ডেকে উঠলো। হাসলো যেন সেটা বুড়ির কথা শুনে। মায়াদেবী আরও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

নরেনবাবুর চোখ দুটোও জলে ভরে উঠেছে। বুড়ি মায়ের পাশেই বসেছিলেন তিনি, হতভম্ব হয়ে। মাকে জড়িয়ে ধরে আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করলেন—"কিন্তু মা! আপনি ঐ নতুন নাতনিটিকে জোটালেন কোথা থেকে?"

বুড়ি নরেনের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালেন, ধীর কণ্ঠে বললেন—"মা-লক্ষ্মীর দান বাবা! সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকার রাত্রে মা-লক্ষ্মী আমার হাতে ঐ হীরার টুকরাডারে সঁইপ্যা দিয়া গেছে।"

মায়াদেবী শিউরে উঠলেন। শাশুড়ীর বুক থেকে মাথা সরিয়ে নিয়ে ব্যাকুল উত্তেজনায় বলে উঠলেন—"সব কথা খুলে বলুন মা!"

"কমু মা! কইতেই অইব!" দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ঘাড় নাড়লেন বুড়ি। বললেন—"যেমুন আমি নদীর পারে আইস্যা পৌছলাম, দেখি কি! মা-লক্ষ্মী কানতে কানতে হাপাইতে হাপাইতে সামনে হাজির। পশুগুলা তারেও মারছে, কাটছে! সারা অঙ্গে তাঁর কাটন ছেরনের ঘাও, রক্ত ঝরতে আছে গা-মাথা-মুখের থন। কথা কইতে পারে না। জোর কইরা আমার কোলের মধ্যে তেনার বুকের বাচ্চাটারে গুইজ্যা দিয়া আছড়াইয়া পড়লো। গোঙাইতে গোঙাইতে কইল—বাছাটার বাপেরে মাইরা ফেলাইছে, আমিও মরতে আছি, বুড়িমা, তুমি অরে রক্ষা কইরো। ব্যস, আর কোনও কথা কইবার পারলো না মা-লক্ষ্মী আমার।"

মায়া কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালো। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—"ছিঃ ছিঃ। বাচ্চাটার কোনও পরিচয়ই নেই!"

দুখুর ঠাকুরমা-বুড়ি মায়ার ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলেন। আঘাত পেলেন মনে। সেই আঘাতেই সব পুরানো কথা তক্ষুনি তাঁর মনের থির সায়রে ভেসে উঠলো। বাতের ব্যথা ঝেড়ে ফেলে, ছেলেমানুষের মতো তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন। তখনই তিনি ছুটলেন, পাশের অন্ধকার ভাঁড়ার ঘরটার দিকে। বিড় বিড় করে বললেন—"আছে, হয়তো আছে। আনতে আছি সেই সম্পদটুক্, এতদিন যা লুকাইয়া থুইছিলাম। একটুক খারাও মা, একটুক খারাও।"

দুখুকে পিছনে ফেলে, লখু আগে আগে দৌড়চ্ছে।

"দাঁড়ারে লখু, দাঁড়া। একটু দাঁড়া।" লখুর পেছন পেছন দৌড়তে দৌড়তে হাঁক দিলে দুখু, হাঁপাতে হাঁপাতে।

"বার বার অমন করে পিছু ডাকছো কেন? মা-বাবার সামনে যেতে তোমার লজ্জা হলে যেয়ো না তুমি।" জবাব দিলে লখু ঘাড় ঘুরিয়ে। রেগে উঠে রীতিমত ফোঁস করে। কথাগুলো বলেই আবার লখু ঘুরে দাঁড়ালো। পাঁই পাঁই সাঁই সাঁই করে ছুটলো ওদের বাড়ির দিকে।

দুখু হতভম্ব। দুখুর পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে। মনের মধ্যে ঝড়, ভূমিকম্প মহাদুর্যোগ! টলতে টলতে তবু সে ছুটলো লখুর পিছু পিছু।

"পাইছি মা! পাইছি! অনেক দিনের হারানো ধনরে আজ আবার খুইজ্যা বার করতে পারছি।" দুখুর ঠাকুরমা চেঁচিয়ে উঠলেন অন্ধকার ভাঁড়ার ঘর থেকেই। টলতে টলতে বেরিয়ে এলেন তিনি বড় ঘরে। কাঠের তৈরী লক্ষ্মীর কৌটোটা হাতে নিয়ে। আনন্দ উত্তেজনায় বুড়ির দুর্বল হাতটা থরথর করে কাঁপছিল বড় বেশি। মুঠোটা আলগা হয়ে লক্ষ্মীর কৌটোটা মেঝেতে পড়ে গেল। কৌটোয় লুকানো সোনার তাবিজটাও মেঝেতে পড়ে দু' ফাঁক হয়ে খুলে গেল!

মায়াদেবী অবাক চোখ দুটোকে আরও বড় করে চেঁচিয়ে উঠলেন—"কী! কী ওটা, দেখি!"

"রসো রসো! আগে আমি দেখি।" নরেনবাবু তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে তাবিজটা কুড়িয়ে নিলেন।

এগিয়ে গেলেন ধীর পদক্ষেপে লণ্ঠনটার কাছে। তাঁর জ্বলজ্বলে চোখ দুটোর আলো ঠিকরে পড়লো দু'ফাঁক তাবিজটার বুকের গহনে।

মন্ত্রীমশাইয়ের প্রকাণ্ড গাড়িটাও তার মস্ত মস্ত হেডলাইট দুটোর চোখ জ্বালিয়ে মোড় ঘুরলো। দুখুদের বাড়ির সামনের মাঠে আসার জন্যে। গাড়ির হেডলাইটের হলদে আলো ঠিকরে পড়লো মাঠের চারধারে। বাড়িগুলোর দেওয়ালে দরজায়। দুখুর বন্ধু বুদ্ধুই গাড়ির ড্রাইভারকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছিল—পেছনের সীটে মন্ত্রীর আসনে বসে। মাথাটা বাইরে ঝুঁকিয়ে দিয়ে। ভাবছিল, মন্ত্রী আর মন্ত্রিগৃহিণী আর কারুর বাড়িতে পা না দিয়ে, দুখুদের বাড়িতে এলেন কেন? এ নিয়ে পাড়ায় ঘোঁট পাকবে। দুখুর শত্রু বাড়বে।"

মন্ত্রীমশাইয়ের চাপরাশী পাঁড়েজীর চোখ দুটো হঠাৎ চমকে উঠলো। হেডলাইটের আলোর ঝলসানিতে হঠাৎ সে দেখতে পেল—গাড়ির ঠিক সামনে, মাঠের মধ্যে দুটো ছেলেমেয়ে ধস্তাধস্তি করছে। পাঁড়েজী চিনতে পেরেছে তার লখিয়াকে। তার লখিয়াই তো একটা ছেলের হাত ধরে টানাটানি শুরু করেছে। ছেলেটার মুখটা দেখা গেল না ভালো করে। পাঁড়েজী ব্যস্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—"রোখো রোখো! মুঝকো পহলে দেখনে দো।" ড্রাইভারও সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামিয়ে দিলে। পাঁড়েজী গাড়ির দরজা খুলে লাফ মেরে দৌড়ালো—ঐ ছেলেমেয়ে দুটোর দিকে।

বত্রিশ

সোনার তাবিজের ভেতরে লুকানো ছোট্ট কাগজের টুকরোটায় ক্ষুদে ক্ষুদে বাংলা হরফে লেখা—জগৎ-পিতার জয়গান। অন্য পিঠে তাবিজের মালিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সেই পরিচয়পত্র

পড়তে পড়তেই মন্ত্রী নরেন চৌধুরী খুঁজে পেলেন নিজের হারানো পরিচয়। চোখ দুটো ভরে উঠেছে টল্‌টলে জলে।

ছোট্ট কাগজের টুকরোটাকে যেমনকার তেমনি গুটিয়ে পাকিয়ে তাবিজের ভেতরে রেখে তাবিজটা বন্ধ করলেন। চোখ মুছতে মুছতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—"মা! মা! মেয়েটির সমস্ত পরিচয়ই লেখা রয়েছে তাবিজের ভেতর লুকানো পরিচয়পত্রে।"

মায়াদেবী মুখ ঘুরিয়ে কান খাড়া করলেন।

"মেয়েটি সম্পর্কে তোমার নাতনীই তো! এর বাবা আর আমি কলেজের একই ক্লাসে পড়তুম মা। ও হলো আমার বন্ধু ধূলোহাটির আবদুল কাদেরের মেয়ে।" বললেন নরেন চৌধুরী বুড়ি মায়ের দিকে এগুতে এগুতে।

মায়াদেবী এগুচ্ছিলেন স্বামীর দিকে। শিউরে উঠে পিছিয়ে গেলেন। চিৎকার করে বললেন—"কাল কেঁউটের বাচ্চা!"

মুখ ঘুরিয়ে নরেনবাবু ভ্রুকুটির চোখে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। শাসনের সুরে বললেন—"আঃ মায়া! অমন কথা উচ্চারণ করো না। ও হলো জগৎ-পিতার সন্তান। ওর অবস্থাটা বিচার করে দেখো মায়া?"

ঠাকুরমা বুড়ি ধীর কণ্ঠে বললেন—"ঠিক! ঠিক কইছ বাবা আমার! একডা শিশুর উপরে অবিচার ক্যামনে করন যায়! আমাগো হিন্দুর ঘরে না জন্মায়ে মোছলমানের ঘরে মাইয়াটা যে জন্মাইছে, হের লাইগ্যা ওর দোষডা কি?" কথা শেষ করে বুড়ি জলভরা চোখে কাতর অনুনয়ের সুরে মায়াকে বললেন—"লও মা লও, ভগবানের সন্তান জাইনাই অরে তোমার কোলে টাইন্যা লও মা! ভগবান তোমারে আশীর্বাদ দিবো।"

মায়াদেবী এতক্ষণ পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ স্থির, শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। করুণাময়ের করুণা-সাগরের ঢেউ এসে লাগলো যেন আচম্বিতে তাঁর বুকে। জাতধর্মের ভেদাভেদ, সংস্কার-বিচারের শক্ত পাথর ভেদ করে নরম তুলতুলে ভালবাসার হাজারো ফুল ফুটে উঠলো। সৌরভ ছড়িয়ে দিল মায়াদেবীর মন-বাগানে।

নিজের ভুল বুঝতে পেরে মায়াদেবী টলতে টলতে এগিয়ে গেলেন শাশুড়ীর দিকে। নিজের অপরাধের অনুশোচনায়, কান্নার বন্যায় ভেসে-আসা ক্ষমার তাগিদেই কেঁদে কেঁদে বার বার বলতে লাগলেন তিনি,—"মাগো মা! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন মা!"

সেই উত্তেজনার মুহূর্তেই আর এক উত্তেজনা। ঘরের বাইরে থেকে কাতর আর্তনাদ ভেসে এলো—"ছেলেধরা! ছেলেধরা!" নরেনবাবু, মায়াদেবী, দুখুর ঠাকুরমা সবাই চমকে উঠলেন।

দুখু লখু ভয় পেয়ে হুড়মুড় দুদ্দাড় করে ছুটে এসে ঘরে ঢুকলো। "মা! মা! ছেলেধরা! ছেলেধরা!" চিৎকার করে লখু মায়াদেবীকে জড়িয়ে ধরলো। দরজার দিকে ভয়ার্ত চোখ দুটো রেখে কাঁপছে তখনও সে।

ঘরে ঢুকে মন্ত্রী আর মন্ত্রীগৃহিণীকে দেখে দুখু লজ্জা ভয়ে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আড়ষ্ঠ দেহে অস্বস্তির চোখ দু'টি খোলা। ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকাচ্ছে মন্ত্রীমশায়ের মুখের দিকে। মন্ত্রীমশাই কাছে গিয়ে ব্যাকুল আগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন— "কী হয়েছে? ব্যাপার কী!"

দুখু জবাব দেওয়ার আগেই পাঁড়েজীর নাগরা-পরা লম্বা পা দু'খানা চড়ে ঘরে ঢুকলো ছেলেধরা নিজেই। ঘরে পা দিয়ে সামনেই মনিব আর মনিব-গৃহিণীকে দেখেই পাঁড়েজী হকচকিয়ে

দাঁড়িয়ে পড়লো দরজার চৌকাঠ ডিঙিয়েই। ভয় আর আনন্দ-মেশানো উচ্ছ্বাসে ছেলেমানুষের মতো বলে উঠলো সে—"মাঈজী! ওহি হামার লখিয়া আছে!" সঙ্গে সঙ্গে লখুর দিকে ব্যাকুল দু'খানা হাত বাড়িয়ে দিলে। জলভরা চোখে আদরভরা ডাক জানিয়ে বললে—"লখিয়া বেটি! হামার উপর গুঁসা মত করো, ভয় না করো। হামি এখুন সাচ্‌মুচ্‌ মন্ত্রীবাবুর রসুই, চাপরাশী!"

লখু খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠেই, চোখ পাকিয়ে গম্ভীর সুরে বললে—"আর তুমি আমাকে বোকা বানাতে পারবে না, আমি এখন সত্যি সত্যি মন্ত্রীর মেয়ে, দাদাভাইও মন্ত্রীর ছেলে!" ঐ ব্যাপারে আরও একটু বেশী নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যেই লখু সঙ্গে সঙ্গে চোখ ঘুরিয়ে চোখ রাখলে মায়ার মুখে, প্রশ্ন করলে—"আমার কথাই ঠিক, না মা?"

লখুর মুখের মিষ্টি 'মা' ডাকে মায়াদেবী পাগল। লখুকে দু'হাতে জাপটে ধরে কোলে তুলে নিলেন। গালে চুমু দিয়ে চাপা গলায় বললেন—"ওর কথাও ঠিক, তোমার কথাও ঠিক।" সঙ্গে সঙ্গে সরে গেল তাঁর চোখ থেকেও ভুল আর সংশয়ের কালো ছায়া। চোখের কোলে, টলমলে জলে খেলে গেল আনন্দ-আলোর ঝিকিমিকি।

বুদ্ধুও অনেকক্ষণ থেকেই দরজার আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আড় চোখে উঁকি মেরে দেখছিল সবই সে। মায়াদেবীর কথা শুনে ভরসা বেড়ে গেল তার। গলা বাড়িয়ে, মাথা নাড়িয়ে সায় দিলে সেও—কথাটার। কিন্তু বুড়ি ঠাকুরমা চোখ বুজে মাথা নাড়িয়ে বলে উঠলেন—"কারও কথাই ঠিক কথা

অইব না, যতক্ষণ না আমরা স্বীকার কইর‍্যা নিতে আছি—আমরা হগ্‌গলেই রাজাগো রাজার সন্তান।”

ঠাকুরমার কথা শুনে দুখুর বুকের ভেতরটা যেন অজানা আনন্দে নেচে উঠলো। মনে হলো, এতদিনে তার সমস্ত ভয়-ভাবনা, দুঃখের বাঁধন নিমেষে আলগা হয়ে গেল। নির্ভয়ে সে “বাবা! বাবা!” বলে মন্ত্রী নরেন চৌধুরীর বুকে মুখ লুকোলো। নরেনবাবুও দুখুকে বুকে নিয়ে জোড় হাত করলেন। রাজাদেরও যিনি রাজা তাঁরই আশীর্বাদ জল হয়ে গড়িয়ে পড়লো তাঁর দু’চোখ বেয়ে।

স মা প্ত